নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শন : স্বরূপ ও লক্ষণবিচার

এম. মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ : নান্দনিক অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অধ্যয়নের নাম নন্দনতত্ত্ব। এটি দর্শনের একটি অঙ্গরাজ্য, যেখানে জীবন ও জগতের বিশেষ করে সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্যকলা ও চারুশিল্পের নিহিতার্থের স্বরূপ বিচার করা হয় এবং মানবমনে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত স্বরূপের মূল্যবোধের ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ করা হয়। নন্দনতত্ত্ব কেবল নান্দনিক অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা করে না, সঙ্গে সঙ্গে সে নান্দনিক প্রত্যয়, নান্দনিক প্রতিক্রিয়া, নান্দনিক ধর্ম, নান্দনিক নীতি, নান্দনিক সুখ, নান্দনিক মূল্য, নান্দনিক মনোভাব, নান্দনিক ক্ষেত্র, নান্দনিক গুণ, নান্দনিক প্রত্যক্ষণ এবং নান্দনিক আদর্শ নিয়েও আলোচনা করে। সৌন্দর্য নন্দনতত্ত্বের অনুসৃত আদর্শ। কিন্তু এই সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক, বিশেষত নান্দনিক মহলে মতভেদের প্রাচীর হিমালয়ের মতো অচল এবং সুদৃঢ়। সৌন্দর্যকে কেউ বলেন আত্মগত, আবার কেউ বলেন বস্তুগত। অবশ্য এই উভয় মতের অনুকূলে পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণও রয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করি তাকে বলে নান্দনিক বোধ বা উপলব্ধি। এই উপলব্ধির স্বরূপও একটি স্বজ্ঞালব্ধ প্রক্রিয়া। এই উপলব্ধি বিষয়ী এবং বিষয়কে এত কাছাকাছি নিয়ে আসে যে, চূড়ান্ত অবস্থায় তাদের মধ্যে পার্থক্যটাই হারিয়ে যায়। সৌন্দর্য আত্মগত না বস্তুগত, তখন আর এ প্রশ্ন ওঠে না। যাই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির স্বরূপ ও লক্ষণবিচার নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি।

ঐতিহ্যগতভাবে নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করে, সৌন্দর্যের আদর্শ নির্ণয় করতে চায়, সৌন্দর্যের স্বরূপ উন্মোচন করতে চায় এবং সৌন্দর্যের আদর্শের আলোকে মানবাচরণ মূল্যায়ন করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনটাই সবকথা নয়, অপ্রয়োজনের প্রয়োজনও মানবজীবনে অপরিহার্য। মানুষ কেবল কাজের কাজ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। অনেক সময় অকাজের কাজেও মানুষ তৃপ্তি লাভ করে থাকে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং নিরাপত্তার জন্য মানুষের কর্মকে বলে প্রয়োজনীয় কর্ম। মানবেতর প্রাণীও এ ধরনের প্রয়োজনীয় কর্ম পালন করে থাকে। কিন্তু মানুষকে এ ধরনের প্রয়োজনীয় কর্ম ছাড়া আরও নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় কর্ম পালন করতে হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং নিরাপত্তা ছাড়াও মানুষের মধ্যে ভূমার আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ ধরনের কর্মের মাধ্যমেই মানুষের বিচিত্র নান্দনিকতা প্রকাশ পায়। এদিক থেকে বিচার করলে মানব প্রজাতির

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহ্যকে সৌন্দর্য বিচারের ইতিবৃত্ত বলেও আখ্যায়িত করা যায়। সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই মানুষ নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ায় নিজ অঙ্গকে সাজিয়ে আসছে। অন্যান্য কাজকে উপেক্ষা করে মানুষ তার গৃহপ্রাঙ্গণকে কুসুমবৃক্ষের আবরণ দিয়ে সাজিয়েছে। এজন্যই মানুষ তার প্রিয়জনের মুখপানে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করে। এভাবেই যুগে যুগে মানুষ নানা ধরনের ছবি অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্যগীত, কাব্যসাহিত্য প্রভৃতি শিল্পকর্মের মাধ্যমে সৌন্দর্যের কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়েছে। শিল্পকর্মের উলি-খিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ সুন্দরকে বিমোহিত চিত্তে খুঁজে বেরিয়েছে। আজ পর্যন্ড় মানুষের এই সৌন্দর্য বিজয়ের অভিযান অব্যাহত আছে। মানুষ ধরে নিয়েছে সুন্দরের গুণাগুণ মূল্যায়ন করা যায়। আর এ থেকেই মানুষের মধ্যে নান্দনিক বোধের উদ্ভব। এই নান্দনিক বোধেরই প্রণালিবদ্ধ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনে।

প্রাথমিক পরিচয়

দর্শনের শিক্ষার্থী বা অনুরাগী হিসেবে বাংলা ভাষায় যাকে আমরা নন্দনতত্ত্ব[১], কান্ড়ি বিদ্যা বা সৌন্দর্যদর্শন বলে অভিহিত করি ইংরেজি ভাষায় এরই চলতি নাম ‘এসথেটিক্স’ (Aesthetics)। এই নন্দনতত্ত্ব ভারতবর্ষে আবার অলঙ্কারশাস্ত্র হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। এটি জ্ঞানার্জনের এমন এক শাখা, যেখানে সৌন্দর্য, সুরুচি ও শিল্পকলার উপলব্ধির স্বরূপ পর্যালোচিত হয়। একে আবার কখনও কখনও শিল্প-সংস্কৃতি ও প্রকৃতির ওপর বিচারমূলক মূল্যায়ন হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। তবে শিল্পদর্শনের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে শিল্পদর্শনের পরিধি থেকে নন্দনতত্ত্বের পরিধি অনেক ব্যাপক। শিল্পদর্শনে কেবল শিল্পকলার আলোচনা থাকে। কিন্তু নন্দনতত্ত্বে শিল্পকলা এবং বিনোদন বিষয়ক যে-কোনো সদর্থক বা নঞর্থক প্রতিক্রিয়া অন্ড়র্ভুক্ত থাকে। নন্দনতত্ত্বে শিল্পকলা এবং শিল্পকলা ছাড়াও অন্য যে-কোনো বস্তুর উপলব্ধি অন্ড়র্ভুক্ত। কিন্তু শিল্পদর্শনে কেবল শিল্পকলার উপলব্ধি ও সমালোচনা অন্ড়র্ভুক্ত থাকে। তাই পরিধির বিচারে নন্দনতত্ত্ব ব্যাপক ও বিস্ড়ৃত।

নন্দনতত্ত্বে সাধারণত যেসব প্রশ্ন তোলা হয় তা এরকম। শিল্পকলা কী? একটি সার্থক শিল্পকলার শর্তাবলি কী? কেন আমরা কোনো বস্তু বা জিনিসের মধ্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধান করি? নিরেট ভিন্ন ধরনের বস্তু কীভাবে একই রকম সুন্দর বলে বিবেচিত হতে পারে? সৌন্দর্য বলতেই বা আসলে কী বুঝানো হয়? শিল্পকলা ও নৈতিকতার মধ্যে সম্বন্ধ কেমন? শিল্পকলা কি সত্যের ধারক ও বাহক হতে পারে? নান্দনিক অবধারণ কি বস্তুনিষ্ঠ বিবৃতি, না-কি ব্যক্তিগত মনোভাবের বিশুদ্ধ আত্মগত বিবৃতি। নান্দনিক অবধারণের উন্নতি বৃদ্ধি করা যায় কি? এর প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব কি? নান্দনিক প্রত্যয়

কী বা কাকে বলে? নান্দনিক ও অনান্দনিক মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য কী? সুন্দরের অঙ্গারাজ্যে অসুন্দরের স্থান আছে কী? নান্দনিক আদর্শ কী? সাধারণভাবে এসব প্রশ্ন নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তাকেই আমরা নন্দনতত্ত্ব বলে অভিহিত করি। সাধারণভাবে বললে, নন্দনতত্ত্বে যেসব বিষয়ের শর্তসমূহ বিচার বিশে- ষণ করা হয় তা হলো সুন্দর বস্ড়ু, বিরক্তিকর বস্ড়ু, মজাদার, বিনোদনমূলক, বিস্ময়কর, মহৎ, মনোরম, বুদ্ধিদীপ্ত, নির্বুদ্ধিমূলক, দাম্ভিক, ভ"ামিপূর্ণ, ঐক্যতানিক, বিসদৃশ, বেসুরো, একঘেঁয়েমি, হাস্যকর ও করুণ ইত্যাদি। কোন্ শর্তে কোনো বস্ড়ুকে এই সমস্ড় বিশেষণে বিশেষিত করা যায় সেটাই হলো এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই,

> অনুসন্ধানী মনের কাছে নন্দনতত্ত্ব একটি বিস্ময়, একটি অন্ড়র্দৃষ্টির অন্য নাম। মানুষ মাত্রই কোনো-না-কোনোভাবে সুন্দরকে উপলব্ধি করে, কিন্ড়ু যদি আমরা নন্দনতত্ত্বের অধ্যয়ন করি, তাহলে আমাদের নান্দনিক বোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত আরও বহু উপাদানকে গভীর ও বিস্ড়ৃতভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। নন্দনতত্ত্ব থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি (Titus, 1968 : 370)।

নন্দনতত্ত্বের উৎপত্তিগত ইতিবৃত্তেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'aesthetics' শব্দটির মূলে আছে গ্রিক 'aesthotos' শব্দ। এর অর্থ হলো, 'to perceive'। এর সঙ্গে সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতুর একটি সৌসাদৃশ্য রয়েছে। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে (দাশগুপ্ত, ১৯৯৭ : ৩), 'aesthetics' শব্দে প্রধানত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ বোঝায় এবং গৌণত যেকোনো ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এমনকি মানসিক সংকল্প বা মানসিক সংকল্পের সামর্থ্যকে পর্যন্ড় বুঝিয়ে থাকে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'aesthetics' শব্দটির মূলধাতু 'aesthotos' অর্থ ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক ব্যাপক। এরপরও ঐতিহ্যগত বিচারে আমরা নন্দনতত্ত্ব শব্দটি শিল্পসাহিত্যের বোধের জগতেও নিয়ে যাই। শিল্পরচনা ও কাব্যপাঠে আমরা যে আনন্দ পাই, সূর্যরশ্মির প্রতিবিম্বে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তা থেকে নান্দনিকের নন্দনতত্ত্ব আরও বেশি ব্যাপক। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিস্ড়ার, গভীরতা, দীর্ঘস্থায়িত্ব, দেশকালের মাত্রা স্রেফ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য ও সম্বন্ধ থেকে আমরা পাই। কিন্ড়ু নান্দনিকতা আপেক্ষিক বিচারে আরও সার্বিক, সর্বাত্মক ও ব্যাপক। নান্দনিক অভিজ্ঞতাই এই সার্বিকতা ও ব্যাপকতার পরিচয় বহন করে চলেছে।

নন্দনতত্ত্ববিদেরা তাই মনে করেন যে, যখন একটি নান্দনিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও তার সম্পূরক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও আবেগাত্মক উপাদান প্রবেশ করে, তখন তার নান্দনিক দিকটি অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে একে তার অন্যান্য সহগামী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে দেখা চলে না। এ প্রসঙ্গে হান্টার মিড-এর একটি মন্ড়ব্য উদ্ধৃত হওয়ার দাবি রাখে। তিনি বলেন :

> আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, একজন শিল্পী যত বেশি সম্পূরক মূল্য সংযোজিত করতে পারবেন, ততবেশি তার শিল্পকর্মের তাৎপর্য বিস্ড়ৃত হবে এবং এর প্রতি আমাদের

> প্রতিক্রিয়াও ব্যাপক বিস্ড়ৃত মানবাভিজ্ঞতা হিসেবে আরও বেশি সম্প্রসারণশীল হবে। কিন্ড়ু আমি সর্বদাই এ বিষয়ে জোর দিয়েছি যে, যদি একটি শিল্পের নান্দনিক মূল্যের এমন কোনো অনন্য ও কেন্দ্রীয় দিক না থাকে, যা প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত এবং যা আমরা একান্ড়ভাবে তার নিজস্ব স্বরূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি, তাহলে তাকে কোনো অর্থেই শিল্পকর্ম বা নান্দনিক বস্ড়ু বলা যায় না। সেটি খুব সুগন্ধের বস্ড়ু হতে পারে, এমনকি মর্মস্পর্শী অনুভবের বস্ড়ুও হতে পারে, কিন্ড়ু শিল্পকর্ম বলে আখ্যাত করা চলে না। একটি শিল্পকর্মের এ ধরনের অন্যান্য নান্দনিক দিক থাকে বলেই তাকে একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা দেওয়া যায়। শিল্পকলার নিজস্ব নান্দনিক মূল্যই তার শিল্প পদবাচ্য হওয়ার ন্যূনতম শর্ত। এটি এমন একটি শর্ত যাকে আর অন্য কোনো মূল্যে পর্যবসিত করা যায় না। নন্দনতত্ত্ব এটাই দাবি করে (Mead, 1952 : 61)।

তাই নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিক মনোভাব সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে জেম্স এল জেরিট বলেন :

> নন্দনতত্ত্ব হলো এক ধরনের নান্দনিক অভিজ্ঞতা, এক ধরনের নান্দনিক মনোভাব, এক ধরনের নান্দনিক গুণ, এক ধরনের নান্দনিক মূল্য এবং এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়, যেমন : শৈল্পিক সৃজনশীলতা, শৈল্পিক আদর্শ, সৌন্দর্য ও এর বিপরীত বিষয় সংক্রান্ড় অধ্যয়ন। যখন কেউ তার অভিজ্ঞতার গুণে নিজেকে উন্মুক্ত করে তখন সে কোনো শিল্পকর্ম বা প্রকৃতির এক টুকরা অংশের মধ্যে নান্দনিক মনোভাব গ্রহণ করে (Jerrett, 1957 : 106)।

হান্টার মিড নান্দনিক মনোভাবের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উলে-খ করেন। এক. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক বিষয়াদির প্রতি নিরাসক্তি[২] নান্দনিক মনোভাবের একটি অপরিহার্য ধর্ম। ব্যক্তি যখন নান্দনিক অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তার এক ধরনের ব্যবহারিক নিরাসক্তি থাকে। দুই. প্রকৃত নান্দনিক মনোভাব সম্পূর্ণভাবে স্বার্থশূন্য ও আধিপত্যহীন। এটি এমন এক মূল্যের উপলব্ধি, যেখানে কোনো অস্থির আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদ থাকে না। এটি এমন এক অনুরাগ, যেখানে কোনো কিছু অধিকার করার সম্ভাবনা থাকে না। এটি এমন এক ধরনের আনন্দ ও সন্ড়ুষ্টির অনুষ্ঠান, যেখানে কোনো আর্থসামাজিক ও ব্যবহারিক প্রতিপত্তি লাভের চিন্ড়া থাকে না। এ ধরনের সম্পূর্ণ স্বার্থনিরপেক্ষ মনোভাবই নান্দনিক অবস্থার মুখ্য ও মৌলিক ধর্ম। তিন. নান্দনিক মনোভাব নৈর্ব্যক্তিক। এজন্য নান্দনিক মনোভাবে ব্যক্তির অভিব্যক্তির সাময়িক বিচ্ছেদ লক্ষ করা যায়। নান্দনিক বস্ড়ুর দ্বারা ব্যক্তি আকৃষ্ট হয়। এক অর্থে ব্যক্তি নিজেকে বাইরের কোনো কিছু হিসেবে উপলব্ধি করে। এ যেন সব ধরনের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। একে নিরাসক্তি ও স্বার্থহীনতার আরেকটি পর্যায় বলে অভিহিত করা যায় (Mead, 1952 : 18)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ পর্যায়ে আমরা নন্দনতত্ত্ব বা কান্ড়িবিদ্যার একটি সংজ্ঞার্থ রচনা করতে পারি। দর্শনের যে শাখাটি জীবন ও জগতের বিশেষ করে সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্যকলা ও চারুশিল্পের নিহিতার্থের স্বরূপ বিচার করে এবং মানবমনে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত স্বরূপের মূল্যবোধের ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ করে তাকে বলে

নন্দনতত্ত্ব বা কান্ডিবিদ্যা। সৌন্দর্যের নিহিতার্থ বিশে-ষণ করে বলে একে সৌন্দর্যদর্শন (Philosophy of Beauty) এবং সৌন্দর্যের বিশে-ষণমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একে বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করতে চায় বলে একে সৌন্দর্যবিজ্ঞান (Science of Beauty) বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যের পূজারী। জগৎ, জীবন আর বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যই মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে নন্দনতত্ত্বের চরমশিখরে নিয়ে যেতে পারে। জ্ঞানার্জনের অন্য কোনো শাখার পক্ষে তা মোটেও সম্ভব নয়। দার্শনিকদের মতে, নন্দনতত্ত্ব শব্দটি প্রাকৃত সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা প্রভৃতির সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কারণ এই সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার চরম প্রকাশ। আর নান্দনিক বিচার বিশে-ষণের মাধ্যমেই আমরা শিল্প বা সাহিত্যের বিচার করি। নন্দনতত্ত্বের দক্ষতা না থাকলে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ সৌন্দর্যবোধের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হতো (দাশগুপ্ত, ১৯৯৭ : ৪)।

কলা বনাম শিল্প

উপরিউক্ত প্রাথমিক আলোচনায় আমরা কলা ও শিল্পকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। এ কথার অর্থ এই নয় যে, কলা ও শিল্প শব্দ দুটি এক ও অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে কলা ও শিল্পের পরিধি যে কত দূর পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত, এ ব্যাপারে এখনও দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। তবে সীমিত অর্থে কলা বলতে আমরা অঙ্কন, চিত্রণ ও ভাস্কর্যকে নির্দেশ করে থাকি। সীমিত অর্থে কলা শব্দটি প্রয়োগ করলে তাতে সংগীত ও সাহিত্য বহির্ভূত হয়ে পড়ে। কিন্ড়ু কলা শব্দটিকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে তাতে চারুকলা, কারুকলা, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিও অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

তবে আমরা আমাদের নান্দনিক আলোচনায় কলা ও শিল্প শব্দ দুটিকে চারুকলা ও চারুশিল্প অর্থে প্রয়োগ করব। কারণ, এই চারুকলা ও চারুশিল্পকে অবলম্বন করেই নন্দনতত্ত্ব সামনের দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে চলছে। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রধর্মে কলার চৌষট্টিটি প্রকারভেদ স্বীকৃত রয়েছে। তবে চারুকলা ও শিল্পে সংগীত, কাব্যসাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য — এই পাঁচটিই অন্ড়র্ভুক্ত বলে নান্দনিকদের ধারণা। এই পাঁচটি বাদে বাকি সবগুলোকে কারুশিল্পের অন্ড়র্ভুক্ত বলে নান্দনিকেরা কবুল করে নিয়েছেন। অবশ্য আধুনিককালের অনেক শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক চারুকলা ও কারুকলার অয়নরেখা মুছে দিয়ে বিশেষ বিশেষ কারুকলাকে চারুশিল্পে উন্নীত করে তাদেরও নান্দনিক আলোচনার অন্ড়র্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তাদের মতে চারুশিল্পকে বলা যায় শিল্পীর সুচারুবৃত্তি এবং সৃজনশীল প্রতিভার নবতর সৃষ্টি। পক্ষান্ড়রে, কারুশিল্পকে দক্ষ এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন কারিগরি শিল্পীর নির্মাণ বলে অভিহিত করা যায়। কাজেই এসবই শিল্পকলা। তাই এগুলোও নান্দনিক আলোচনার অন্ড়র্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক যে, নন্দনতত্ত্ব, কান্ডিবিদ্যা বা সৌন্দর্যদর্শন শব্দগুলো কিন্ড়ু প্রাচীন নাম বা অভিধা নয়। দর্শনের যে বিশেষ শাখাটিকে আজ আমরা নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শন[৩] বলে আখ্যায়িত করে থাকি, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে তাকে অলঙ্কারশাস্ত্র হিসেবে ডাকা হতো। তবে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রকে নন্দনতত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা গেলেও অলঙ্কারশাস্ত্র কিন্ড়ু প্রধানত নাট্যতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করত। নাট্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব ছাড়া শিল্পশাস্ত্রের অন্য কোনো শাখা তখন অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ড়র্ভুক্ত ছিল না। উদাহরণ হিসেবে এখানে অভিনব গুপ্তের *ধ্বন্যালোক* এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* শীর্ষক দুটি গ্রন্থের নাম উলে-খ করা যেতে পারে। এ দুটি গ্রন্থে প্রধানত নাট্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বের ওপরই আদ্যতা প্রদান করা হয়েছে। সেজন্য নাট্যতত্ত্বকে অনেক সময় আমরা যৌথ শিল্পকর্ম বলে মনে করি। এ হিসেবে সংগীত, বাদ্য এবং নৃত্যকলাও এর অন্ড়র্ভুক্ত।

সম্ভবত এ কারণেই আচার্য ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-এ অলঙ্কারশাস্ত্রকে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের মর্যাদা দান করেছেন। আজকাল যথার্থ নন্দনতত্ত্ব বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র, সংগীতবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র তার অনুরূপ না হলেও এসব শাস্ত্রে কিন্ড়ু নান্দনিক আলোচনাই ইতস্ড়ত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে 'সৌন্দর্য, শব্দটির উপস্থিতির অভাবও আমরা লক্ষ করি না। প্রখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় নান্দনিক আচার্য বামন তাঁর *কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি* শীর্ষক গ্রন্থের একস্থানে 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারম্'-এর উলে-খ করেছেন। তার মানে অলঙ্কার ও সৌন্দর্য এক ও অভিন্ন। তবে আধুনিক নান্দনিকেরা নন্দনতত্ত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অয়নরেখা টানার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটোলের *Poetics* এবং *Aesthetics*-এর মধ্যে যে ধরনের ভিন্নতা বিদ্যমান, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র এবং অধুনা কথিত নন্দনতত্ত্বের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। কাব্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে নন্দনতত্ত্বের কিছুটা আভাস থাকলেও কাব্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যতত্ত্বকে যেমন আমরা নন্দনতত্ত্বের মর্যাদা দিতে পারি না, অনুরূপভাবে অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের আপাতসাদৃশ্য দেখে আমরা এমন সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হতে পারি না যে, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্ব এক ও অভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও বলে রাখা প্রয়োজন যে, নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার শুরুতেই আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে, শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Aesthetics, যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা নন্দনতত্ত্ব, কান্ডিবিদ্যা, সৌন্দর্যদর্শন, শিল্পদর্শন, শিল্প-সমালোচনা, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ অহরহ ব্যবহার করে আসছি। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে এটি অলঙ্কারশাস্ত্র হিসেবেও সমধিক পরিচিত ছিল, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়টি নিয়েও আমরা বিশদে আলোচনা করেছি। তবে বাংলা ভাষায় বিষয়টিকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Aesthetics শব্দটির প্রথম ব্যবহারের মূলে আমরা যাঁর নাম পাই তিনি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বার্লিন

নিবাসী জার্মান দার্শনিক আলেকজান্ডার বৌমগার্টেন। ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *Reflection of Poetry* শীর্ষক এক কালজয়ী ও ধ্রুপদী গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম এই aesthetics শব্দটি ব্যবহার করেন বলে আধুনিক বিদ্বানদের ধারণা। এ কারণে তাঁকে আধুনিক নন্দনতত্ত্বের জনক বলে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তিনিই প্রথম Aesthetics-এর মূল প্রতিশব্দ aesthotos শব্দে শিল্পরসিক এবং রসিক শিল্পী এবং aesthetician বলতে কলাতাত্ত্বিক বা নান্দনিককে বুঝিয়েছেন। তাঁর আগে আর কেউ বিষয়টি নিয়ে অতীতে এ ধরনের কোনো প্রণালিবদ্ধ আলোচনা করেননি।

তাই একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনকে কোনো বিশেষ শিল্পকলার ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক জ্ঞানের যোগফল বলে অভিহিত করা যায় না।[৪] সৌন্দর্যদর্শন বা নন্দনতত্ত্ব ভালোভাবে অর্জন করলে কেউ রূপদক্ষ শিল্পী বলেও নিজেকে দাবি করতে পারেন না। নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের লক্ষ্য কিন্তু কাউকে রূপদক্ষ বানানো নয়। যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র (Logic) ভালোভাবে অর্জন করলে যেমন কেউ ভালো ন্যায়বিদ বা যুক্তিবিদ হয়ে যান না, নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র (Ethics) সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকলেই যেমন যে কেউ ভালো নীতিবিদ হয়ে যান না, নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের বেলায়ও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শিল্প ও সুন্দরের অভিজ্ঞতা ছাড়া নান্দনিক আলোচনা একেবারেই অর্থহীন। শিল্পপিপাসা, শিল্পসম্ভোগ এবং শিল্পায়ন এ তিনটি নান্দনিক আলোচনার ভিত্তিমূলে কাজ করে। নন্দনতত্ত্বের সঠিক এবং একান্ত অধ্যবসায় থেকেই আমরা এগুলো সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে পারি। এগুলোকে ভিত্তি করেই শিল্পাবেগকে জাগ্রত করে, শিল্পজ্ঞান অর্জন করে নান্দনিকেরা নান্দনিক জ্ঞান ও নান্দনিক চেতনা লাভ করেন। আর এর ফলেই জ্ঞানার্জনের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে উদ্ভব ঘটে নন্দনতত্ত্বের। শিল্পবিন্যাস, শিল্পসম্ভোগ এবং শিল্পায়নের প্রণালিবদ্ধ ধারাবাহিক গবেষণার ফলই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শন। নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শন যেমন একটি ঘটমান শাস্ত্র, তেমনি এটি একটি ক্রমবর্ধমান শাস্ত্রও বটে। কাজেই নন্দনতত্ত্ব কাউকে সরাসরি নান্দনিক হিসেবে তৈরি না করলেও এর একান্ত পাঠন-পাঠন ও অনুসন্ধিৎসু গবেষণা মানুষকে সৌন্দর্যবোধে সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এখানেই নিহিত হয়েছে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের সার্থকতা। নন্দনতত্ত্বের নিহিতার্থকে আরও সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে এবার নান্দনিক অবধারণ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে মনে করি।

নান্দনিক অবধারণ

সংবেদনের স্তরে নান্দনিক মূল্যবিষয়ক অবধারণ আমাদের প্রভেদ, পার্থক্য বা বিযুক্তিকরণের সামর্থ্যের ওপর সতত নির্ভরশীল। কিন্তু সাধারণত তা একেও অতিক্রম করে যায়। সৌন্দর্য বিষয়ক অবধারণ একই সঙ্গে সংবেদ্য, আবেগাত্মক এবং

বৌদ্ধিক। তাই নান্দনিক অবধারণকে কেবল সংবেদ্য বা আবেগাত্মক কিংবা কেবল বৌদ্ধিক বলে মনে করা যায় না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়ল কান্ট-এর মতে, সৌন্দর্য হলো বস্তুনিষ্ঠ এবং সর্বজনীন। কান্ট মনে করেন, কিছু বস্তু অবশ্যই সবার কাছে সুন্দর। তবে সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় একটি ধারণা রয়েছে, যা মূলত আত্মগত এবং তা জাতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে।

যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে, সমস্ত নান্দনিক অবধারণই কোনো-না-কোনোভাবে সংস্কৃতি সাপেক্ষ এবং তা কাল পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন: ব্রিটেনের ভিক্টোরিয়েরা একসময় আফ্রিকার ভাস্কর্যকে কুৎসিত হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু এর কয়েক দশক পরেই ওই একই ভাস্কর্যটির মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। তবে নান্দনিক মূল্যের অবধারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যের অধ্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন : আমরা একটি দামি গাড়িকে অংশত সুন্দর বলে বিবেচনা করতে পারি এই কারণে যে, তা আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে অঙ্কিত, অথবা আমরা একে অংশত ন্যাক্কারজনক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এই কারণে যে, এটি অতি অপচয় এবং ভোগবাদী মনমানসিকতার লক্ষণ, যা আমাদের প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

এখানে নান্দনিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে নান্দনিক অবধারণ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলার মধ্যে একাত্ম হতে পারে? ভিন্ন ধরনের শিল্পকলার সৌন্দর্য সম্পর্কে নান্দনিক অবধারণ একক সিদ্ধান্তে কীভাবে পৌঁছে? যেমন : আমরা একজন ব্যক্তিকে যেমন সুন্দর বলি, তেমনি একটি বাড়ি, একটি গাড়ি, একটি সুর, একটি গল্প ও একটি গাণিতিক প্রমাণকেও সুন্দর বলে অভিহিত করি। এখানে প্রশ্ন হলো, এসব বৈচিত্র্যময় বস্তুর মধ্যে কি এমন কোনো সাধারণ ধর্ম নিহিত আছে, যার জন্যে তাদের সবগুলোকে আমরা 'সুন্দর' নামক একই বিশেষণে বিশেষিত করছি? এজন্যই এখানে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নান্দনিক অবধারণে ভাষার প্রয়োগ থেকে যে দ্ব্যর্থকতা ও অস্পষ্টতার উদ্ভব হয় তা আমাদের অধিক প্রহেলিকার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং সাধারণত প্রায়ই নিয়েও থাকে। যেমন : দুজন ব্যক্তির দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভবকে একটি অভিন্ন উক্তির দ্বারা যেমন প্রকাশ করা যেতে পারে, তেমনি আবার একই অনুভবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায়। এবার শিল্পকলা বলতে নান্দনিকেরা কী বুঝিয়ে থাকেন তার আলোচনা করা যেতে পারে।

শিল্পকলা কী?

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছে তার উত্তর নির্ভর করছে শিল্পকলা বলতে নান্দনিকেরা কী বুঝিয়েছেন তার ওপর। সাম্প্রতিককালে আর্ট বা শিল্পকলা শব্দটি সাধারণভাবে সৃজনশীল শিল্পকলা, চারুকলা বা ললিতকলার সংক্ষিপ্ত শব্দসংকেত

হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে, যেখানে শিল্পীর সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করার জন্য একটি ক্রেতার প্রয়োজন হয়, অথবা যেখানে দর্শকের নান্দনিক সংবেদনশীলতা উপস্থিত থাকে, অথবা যেখানে কোনো সুচারু বস্ড়ুর দিকে দর্শককে আকর্ষণ করা হয়। যদি সংশি- ষ্ট দক্ষতা অনতিশীল, লোকাচারিক ও ব্যবহারিক হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শিল্পকলা শব্দটির পরিবর্তে প্রায়শই 'কারুশিল্প' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, সংশি- ষ্ট দক্ষতার প্রয়োগ বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক হলে একে 'ডিজাইন' (Design) বা ফলিতশিল্প বলা যেতে পারে। যদিও কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, শিল্পকলা সম্বন্ধে মূল্যবাচক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ললিতকলা এবং ফলিতশিল্প বা কারুশিল্পের এই পার্থক্য যেকোনো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত পার্থক্য অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

কুড়ি শতকের শুরুতে শিল্পকলায় ডাডা আন্দোলনের পর এটি আর ধরে নেয়া যায় না যে, সব শিল্পকলার লক্ষ্য হলো সৌন্দর্য। কেউ কেউ মনে করেন যে, শিল্পকলার বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালায় যা থাকে এবং শিল্পীরা যা বর্জন করেছেন তাকেও শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাতে তার প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞার্থ যেমনই হোক-না-কেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার, যেমন ডিউঈ প্রমুখ মনে করেন যে, কোনো শিল্পকর্ম যে প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিলাভ করে এবং তা যেভাবে প্রদর্শিত হয় সেটাই হলো তার শিল্প হয়ে ওঠার শর্ত; কোনো বস্ড়ুর স্বরূপধর্ম ও তার প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার কারণে তা শিল্প পদবাচ্য হয়ে ওঠে না। দৃষ্টান্ড়স্বরূপ, যদি কোনো লোক কোনো শব্দাবলিকে কবিতা হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে তা একটি কবিতা হবে, তাতে অন্য লেখকেরা তা স্বীকার করুন আর অস্বীকার করুন। কিন্ড়ু যদি ওই একই শব্দাবলি কোনো সাংবাদিক তার নোট খাতায় টুকে রাখেন তাহলে তা কবিতা পদবাচ্য হবে না।

অন্যান্য ভাষ্যকার যেমন লিও টলস্টয় প্রমুখ দাবি করেন যে, একটি শিল্পকর্ম শিল্প পদবাচ্য হয়ে উঠবে কী না তা তার নির্মাতার অভিপ্রায়ের ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয় বরং তার শ্রোতা ও দর্শক যেভাবে তা অনুভব করে তার ওপর নির্ভরশীল। কর্মপ্রক্রিয়াবাদীরা, যেমন মনরো বিয়াজলি (Functionalism; Monroe Beardsley, 1915-1985) মনে করেন যে, কোনো একটি বিশেষ প্রসঙ্গে কোনো কিছু যে ভূমিকা পালন করে তার ওপর নির্ভর করে তা শিল্পকলা পদবাচ্য হবে কি-না। দৃষ্টান্ড়স্বরূপ, একটি গ্রিক কলস অশৈল্পিক ভূমিকা পালন করে তখন, যখন তা নিষিদ্ধ কোনো কিছু রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার ওই একই কলস অন্য কোনো প্রসঙ্গে শৈল্পিক ভূমিকাও পালন করতে পারে।

পরাতাত্ত্বিক ও সত্তাতাত্ত্বিক স্ড়রে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা যায়; যখন আমরা কোনো নাটক দেখি, তখন কি আমরা বিশেষ কোনো শিল্পকলাকে বিচার বা মূল্যায়ন করি? না-কি আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে বহু শিল্পকলার মূল্যায়ন করি, যেমন লিখিত নাটকটির, পরিচালনা ও প্রযোজনা, অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় ও সাজসজ্জা প্রভৃতি? সংগীত বা শিল্পকলা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। কুড়ি শতকে

প্রত্যয়গত শিল্পকলার উদ্ভবের পর ওই সমস্যাটি আরও বেশি তীব্র ও প্রকট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ড়স্বরূপ, আমরা যখন শিল্পী এন্ডি অরহল (Andy Worhol)-এর ব্রিলো বক্স (Brillo Boxes) চিত্রের দিকে তাকাই তখন আমরা ঠিক কী বিচার করি?

নান্দনিকেরা আরও প্রশ্ন তোলেন যে, শিল্পকলার মূল্য বলতে কী বোঝায়? শিল্প কি কোনো এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান অর্জনের উপায়? শিল্প কি কোনো মতবাদে বা সাংস্কৃতিক অভিযোজনে দীক্ষাদানের উপায়? শিল্প কি অন্য কোনো কিছু লাভের রাজনীতির পরাকাষ্ঠা বলে পরিগণিত হতে পারে? মানবিক অবস্থা সম্পর্কে শিল্পকলা কি কোনো অন্ড়র্দৃষ্টি প্রদান করে? শিল্প কি আমাদের আরও বেশি ন্যায়পরায়ণ করে গড়ে তুলতে পারে? শিল্প কি আমাদের আধ্যাত্মিক স্ড়রে উন্নীত করতে পারে? শিল্পীর কাছে শিল্পের মূল্য যেমন হয়, তা কি তার দর্শকশ্রোতার কাছেও তেমনই হবে? সমাজের কাছে শিল্পের মূল্য যেমন হয়, তা কি ব্যক্তির কাছেও তেমনই হবে? নান্দনিকেরা এসব প্রশ্নও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে নান্দনিক অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য ও শিল্পকলার আন্ড়ঃসম্পর্কের ওপর।

নান্দনিক অভিজ্ঞতা : সৌন্দর্য ও শিল্পকলা

নান্দনিক অভিজ্ঞতা কীভাবে সৌন্দর্য ও শিল্পকলার সঙ্গে কিংবা কীভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য ও শিল্পকলা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত? এখন এটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য প্রশ্ন। নান্দনিক প্রতিক্রিয়া কাকে বলা যায়, সৌন্দর্য বলতেই বা কী বোঝানো হয়, তা নিয়ে নান্দনিকেরা পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। সুন্দরের এরূপই এ ধরনের ভিন্নতার কারণ নয়, বরং সুন্দরকে প্রকাশ করার মধ্যে উপস্থাপনার যে মাত্রাকে লক্ষ করা যায় সেটাই ওই ভিন্নতার মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। কাজেই যে বস্ড়ুর মধ্যে অন্য কেউ সৌন্দর্য খুঁজে পায়, যদি সেই বস্ড়ুর মধ্যে আমরা কোনো সৌন্দর্য খুঁজে না পাই, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের মূল্যায়নকে মূলতবি রাখাই সঙ্গত হবে, যতক্ষণ না আমরা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে বিশে- ষণ করার যোগ্য হয়ে উঠি।

নান্দনিক অভিজ্ঞতাই যাবতীয় শিল্পকলার ভিত্তি। যার কোনো নান্দনিক মূল্য নেই, তাকে শিল্পকলা হিসেবে গ্রহণ না করাই উচিত হবে। কেউ কেউ নান্দনিক অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পকলাকে বিচ্ছিন্ন করে একে অন্য কোনো মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চান, যার সঙ্গে বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রত্যয়ের সম্পর্ক অত্যন্ড় ক্ষীণ বা একেবারেই নেই। এসব ক্ষেত্রে শিল্পকলাকে পোশাকি ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা হয়। খ্যাতি বা সম্মান বৃদ্ধির উপায় হিসেবে অথবা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে সঠিক মত প্রচার করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্ড়ু, শিল্পকলা নান্দনিক বিশে- ষণের ন্যায্যতা প্রদান করে কেবল যদি তার বিশুদ্ধ নান্দনিক মূল্য থাকে (Titus, 1968 : 373)। আর এই নান্দনিক মূল্য অনেকাংশেই নির্ভরশীল সৌন্দর্যের ওপর।

সৌন্দর্যের বহু ও বিচিত্র সংজ্ঞার্থ রয়েছে। কখনও একে 'সত্য' হিসেবে, কখনও 'আদর্শের প্রকাশ' হিসেবে, কখনও 'নান্দনিক বোধের জন্য পর্যাপ্ত ধর্মের সমন্বয়' হিসেবে, কখনও বা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' (harmony in diveristy), অথবা 'স্বরূপত বস্ড়ুর স্বতঃমূল্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যখন এসব সংজ্ঞার্থের মধ্যে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা না যায়, তখনও বলা যায় যে, সৌন্দর্যের ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। এটি আমাদের কাছে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আমাদের বেশিরভাগ লোকের জন্য সুন্দরের উপস্থিতি সর্বদাই ধারাবাহিকভাবে থাকে। এমনকি, যারা সর্বাধিক বৈচিত্র্যহীন ও অস্বস্ড়িকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেন, তারাও কোনো-না-কোনো অভিব্যক্তির মধ্যে কারও মুখম-ল, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সূর্যাস্ড়, নীল আকাশ, মেঘলা আকাশ ইত্যাদির মধ্যে সুন্দরের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়ে যান। সুন্দরকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য সবার সমান নয়, কিন্ড়ু সেক্ষেত্রেও তাকে উপভোগ করার সম্ভাবনা সবার ক্ষেত্রে রয়ে যায়।

চিরাচরিত নন্দনতত্ত্বের মতো সমকালীন নন্দনতত্ত্বেও একথা কবুল করে নেয়া হয়েছে যে, যা সুন্দর নয় তা শিল্প নয়, এবং যা শিল্প তা অবশ্যই সুন্দর। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নয় তা সুন্দর নয়। কাজেই তা শিল্পও নয়। এই চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে শিল্পকলা ও সুন্দরের যে ধরনের নিবিড় সম্পর্ক আমরা লক্ষ করছি তা থেকে শিল্পকলার আধুনিক ভাষ্য অনেক অনেক দূরে। যদি কোনো শিল্পী নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতামূলক গুণের শৈল্পিকরূপ দিতে চান, তাহলে তিনি যেমন কুৎসিতকে প্রকাশ করার ব্যাপারে স্বাধীন, তেমনি সুন্দরকে প্রকাশ করার ব্যাপারেও স্বাধীন। শিল্পকলার আধুনিক ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো বস্ড়ুকে শিল্পী যেভাবে দেখেন, অবশ্যই তাকে ঠিক সেভাবেই চিত্রিত করতে হবে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীকে তার জীবনদৃশ্যের অংশ থেকে এমন সব বিষয় অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়, যা কুৎসিত, দুঃখজনক, নিষ্ঠুর ও অন্যায্য। কিছু শিল্পকর্ম সুন্দর নয়, এবং কিছু জিনিস শিল্পকর্ম নয়, যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য। অতএব, সুন্দর হওয়াকে শিল্পকলার মানদ- হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে মানুষের প্রতি মর্মস্পর্শী হওয়ার সম্ভাবনাকে অব্যাহত রাখা যায়।

নান্দনিকেরা বিশে- ষণ করে দেখিয়েছেন যে, শিল্পকর্মের নান্দনিক অভিজ্ঞতা অন্ড়ত চারটি জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (Titus, 1968 : 373-374)।

এক. শিল্পকলার অবশ্যই একটি মাধ্যম (medium) থাকে। যে উপাদান দিয়ে এক ধরনের শিল্পকর্ম রচিত হয়, তাহলো ওই ধরনের শিল্পকর্মের মাধ্যম। একেক ধরনের শিল্পকলার মাধ্যম বা উপাদান একেক প্রকারের হয়। সংগীত, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উপাদান জাতিগতভাবে ভিন্ন। যেমন : সংগীতের উপাদান শব্দ, ধ্বনি বা স্বর, ভাস্কর্যের উপাদান বিভিন্ন ধরনের কঠিন জড়াবস্থা, চিত্রকলার উপাদান বস্ড়ু বা বর্ণ ইত্যাদি। আবার একেক প্রকারের উপাদানের অন্ড়র্গত বিভিন্ন প্রজাতির উপাদান থাকে। যেমন :

একটি ভাস্কর্য পাথর দিয়ে তৈরি হতে পারে, আবার মৃত্তিকা ও বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থ দিয়েও তৈরি হতে পারে। শিল্পকর্মের সম্পূর্ণ পরিণতি জুড়েই থাকে উপাদানের পরিব্যাপ্তি। তবে, এটাই একমাত্র নান্দনিক অনুভূতিকে নির্ধারণ করে না।

দুই. শিল্পকলা অবশ্যই কোনো-না-কোনো কৌশল (technique)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। শৈল্পিক পরিকল্পনা সাধনের জন্য যে পদ্ধতি, নৈপুণ্য ও দক্ষতা পূর্বাপর অনুসরণ করা হয়, তাই হলো শিল্পকর্মের কৌশল। এটি বিশেষ কোনো আকারগত বিন্যাস-কাঠামো হতে পারে। যেমন : কিউবিজম বা জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। আবার ওই বিন্যাস-কাঠামোর সম্পূর্ণতা দেখার জন্য শিল্পীর নৈপুণ্য, দক্ষতা বা সামর্থ্যকেও কৌশল বলা যায়। কৌশলের সামর্থ্যের ওপর শিল্পকর্মের মান সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। যেমন : একটি উৎকৃষ্ট সংগীত থেকে একটি নিকৃষ্ট বা মাঝারি মানের সঙ্গীতের পার্থক্য ঘটতে পারে তাদের কৌশলের উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার ওপর। একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের কৌশলও উৎকৃষ্ট হয়। একটি নিকৃষ্ট কৌশল কোনো শিল্পকর্মকে নিকৃষ্ট করে তুলতে পারে। তাই শৈল্পিক পরিকল্পনা সাধনের দক্ষতা, নৈপুণ্য বা কৌশল সম্বন্ধে সচেতন হলে নান্দনিক অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হয়।

তিন. শিল্পকর্মের অবশ্যই একটি আকার (form) থাকে। একটি সমগ্র শিল্পকর্মের বিভিন্ন অংশের ক্রম বা বিন্যাস ব্যবস্থাকে বলে আকার। একটি সংগীত হলো বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি বা স্বরের ক্রম বা বিন্যাস; একটি নৃত্য হলো বিভিন্ন মাত্রা বা লয়ের গতিচাঞ্চল্যের ক্রম বা বিন্যাস। একটি মর্মস্পর্শী শিল্পকর্মের জন্য নির্দিষ্ট এক ধরনের আকারগত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এই শর্তটি কেমন হবে, এ নিয়ে শিল্পরসিক ও নান্দনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এর তালিকায় সাধারণত এ বিষয়গুলো উলে- খ করা হয় : ঐক্য, ক্রম, তাল, লয়, ভারসাম্য, সামঞ্জস্য, সমানুপাত, শৃঙ্খলা, সুসঙ্গতি এবং গভীরতা। শিল্পকর্মের অংশগুলো এমনভাবে বিন্যস্ড় হবে যাতে তা নান্দনিকভাবে সন্ড়োষজনক বলে বিবেচিত হয়। তা যেন সমতাহীন বা শিল্পগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক টানাপড়েনের কারণ না হয়ে পড়ে।

চার. শিল্পকলার একটি আধেয় বা বিষয়বস্ড়ু (content) থাকে। একটি শিল্পকর্ম যা বলতে চায়, যা উপস্থাপন করতে চায়, বা যে বিষয়বস্ড়ুকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে সেটাই তার আধেয় বা উপাদান। শিল্পকলার আধেয়ের পরিব্যাপ্তি শিল্পীর সমগ্র অভিজ্ঞতার বিষয় জুড়ে বিস্ড়ৃত হতে পারে। যেমন : কোনো কিছুর প্রতিকৃতি, একটি পশু, পতঙ্গ, সূর্যাস্ড়, গাছপালা, ঝরনা, নদী, মেঘমালা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ঘৃণা, রোমাঞ্চকর অভিযান ইত্যাদি অনেক কিছু। যা শিল্পকলার বিষয় হয়, যা শিল্পকলায় চিত্রিত হয় তাকেই বলা হয় নান্দনিক বস্ড়ু। একটি নান্দনিক বস্ড়ু হতে পারে আমাদের জীবনের অতি সুপরিচিত কোনো জিনিস অথবা কোনো আবেগ, অভিব্যক্তি ও অন্ড়র্দৃষ্টি। একজন শিল্পী তার শিল্পকর্মের মধ্যে আমাদের শিল্পের এমন একটি অংশকে চিত্রিত করতে পারেন, যাকে তাঁর অন্ড়র্দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়

না।

কোনো কোনো শিল্প-সমালোচক মনে করেন যে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'কীভাবে' প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'কী' প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ শিল্পের আকারটাই গুরুত্বপূর্ণ, এর আধেয় বা বিষয়বস্তু তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, আকার ছাড়া কোনো কিছু শিল্পকর্মের মর্যাদা পেতে পারে না। কিন্তু আধেয় বা বিষয়বস্তু শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। নন্দনতত্ত্বে একেই বলা হয় আকার-আধেয়ের বিতর্ক, যা মূলত দার্শনিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা কার মূল্যায়ন করব? শিল্পের বিষয়বস্তুকে, না-কি তার আকারকে? এটাই এখানে মুখ্য সমস্যা। এই সমস্যাকে উপস্থাপন করার জন্য কোনো একটি প্রবন্ধই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ পর্যায়ে শিল্পকলার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

শিল্পকলার তত্ত্ব

মানব ইতিহাসে শিল্পকলা-বিষয়ক বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে, যাদের কোনো একটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়। আমরা এখানে অধিক জনপ্রিয় কয়েকটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এসব তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো তত্ত্বে শিল্পকর্মের উৎস, উৎপত্তি বা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো তত্ত্বে শিল্পকর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো তত্ত্বে শিল্পী ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বগুলো সম্পর্কে পরিচিত হলে তা যেমন শিল্পের গভীরতা ও উৎকর্ষকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে, তেমনি এর মাধ্যমে শিল্প সম্বন্ধে কিছু অসত্য ধারণাকেও বর্জন করা যায়।

এক. প্রথম তত্ত্বটির নাম 'অনুলিপি হিসেবে শিল্প' (art as imitation)। অনুলিপি হিসেবে শিল্পের ধারণা প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের সময় থেকেই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে মূলত পে-টো এবং এরিস্টটল-এর সমর্থনের কারণে। তখন সৌন্দর্যের বিষয়কে ইন্দ্রিয়লব্ধ অন্যান্য বিষয় থেকে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র বলে বিবেচনা করা হতো না। শিল্পের বিশিষ্ট অনুরাগী এবং একইসঙ্গে কঠোর সমালোচক পে-টো তাঁর সমস্ত ডায়ালগেই অনুলিপি হিসেবে শিল্পের ধারণার উলে-খ করেন। এ ধারণার মূলকথা হলো, একটি শিল্পকর্ম কোনো কিছুর অনুলিপি, অনুকৃতি বা নকল। যেমন : চিত্র ও ভাস্কর্য হলো কোনো বস্তু বা মানুষের প্রতিকৃতি; সংগীত হলো মানুষের মানোবৃত্তি ও আবেগের অনুলিপি। পে-টোর কাছে শিল্পের বিষয় বা প্রতিরূপ হলো মূলবস্তুর অসম্পূর্ণ নকল বা অনুকৃতি মাত্র। তবে লক্ষণীয় যে, শিল্পের অন্যান্য ব্যাপারকেও পে-টো সমর্থন করেছেন।

পে-টোর সুযোগ্য ভাবশিষ্য এরিস্টটল অনুলিপির মধ্যে একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা লক্ষ

করেন। এর সঙ্গে তিনি এটাও লক্ষ করেন যে, বস্তু বা চিত্রিত দৃশ্যের উপলব্ধি থেকে সুখের অনুভব উৎপন্ন হয়। এই প্রাকৃতিক প্রবণতা ও সুখের অনুভবকে তিনি শিল্পের ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিরূপ গঠনের অপেক্ষা থেকে চিত্রের উদ্ভব ঘটে। নাটকে নকল করা হয় ক্রিয়াশীল মানুষের আন্তঃসম্পর্ক। যেমন : হাস্যরসাত্মক নাটকে মানুষের হাস্যকর অসঙ্গত কর্মকাণ্ডের অনুকরণ করা হয়। করুণ নাটকে মানুষের বাস্তব জীবনের দুঃখজনক ঘটনার নকল করা হয়। এভাবে একই ধরনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও বস্তুর মধ্যে যা সাধারণভাবে বিদ্যমান, যা তাদের আদর্শস্বরূপ লক্ষণধর্ম (Universal) তাকে আমরা অনুলিপির মাধ্যমে চিত্রিত করার চেষ্টা করি। শিল্পের এ ধরনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল হওয়ার কারণে এবং তাতে একাধিক সমস্যার সমাধান ও একাধিক প্রশ্নের উত্তর থাকার কারণে উত্তরকালীন চিন্তাবিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সাম্প্রতিক সময়ের পূর্বে এই ব্যাখ্যা কোনো না-কোনোভাবে টিকে ছিল অটল সত্য হিসেবে (Titus, 1968 : 375)।

দুই. দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে নান্দনিকেরা 'সুখের অনুভূতি হিসেবে শিল্প' (art as pleasure) নামে অভিহিত করেছেন। একটি জনপ্রিয় ধারণা অনুসারে, শিল্পী হবেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও উল-সিত হন এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টিতে নিমগ্ন থেকে সময় অতিবাহিত করেন। শিল্পী তার সৃষ্টি থেকে যেমন সুখের অনুভূতি পান, তেমনি তা দিয়ে অন্যকে সুখ দেওয়ারও চেষ্টা করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, সুখ প্রদান করাই হলো শিল্পের প্রধান ধর্ম এবং এর ভিত্তিতেই শিল্পের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। যদি একটি শিল্পের বিষয় সুখ প্রদান করে তাহলে তা ভালো শিল্পকলা হিসেবে বিবেচিত হবে। মানুষ বিনোদন ও সুখ লাভের জন্যই নাটক দেখে, গান শোনে, চিত্র প্রদর্শনীতে যায়। শিল্পের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য হলো নান্দনিক সুখ প্রদান করা। নান্দনিক সুখ এক বিশেষ ধরনের সুখ, যা ঐতিহ্যগতভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পে-টো যদিও সুখকে পরম শ্রেয় হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তবু তিনি সুখের ধারণার সঙ্গে অনুলিপির ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে সুখের অনুভূতি হিসেবে শিল্পের ব্যাখ্যাকে কোনো-না-কোনোভাবে সমর্থন করেন। তাঁর মতে যা সুখজনক, শিল্পকলা তারই অনুলিপি।

তিন. নান্দনিকেরা তৃতীয় তত্ত্বটিকে 'খেলা হিসেবে শিল্প' (art as play) নামে অভিহিত করেছেন। সুখের অনুভূতি হিসেবে শিল্পের ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব অনুসারে, শিল্পকলা হলো জীবন থেকে পলায়নমুখী একটি কর্ম। এই তত্ত্ব ব্যক্তির উদ্বৃত্ত ও খেলার ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মানুষ কর্ম করে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের তাগিদে। এই কর্মের মধ্যে রয়েছে কঠোর শ্রম, প্রচেষ্টা ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়েই ওই কর্ম সম্পাদন করা হয়। অন্যদিকে, খেলাধুলার মাধ্যমে প্রাণীর অতিরিক্ত স্ফূর্তির নির্গমন ঘটে। আমরা একে গ্রহণ করি আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের উপায় হিসেবে নয়, বরং আমাদের

উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত স্বস্তির নির্গমনের জন্য। এক ধরনের অভিব্যক্তির প্রয়োজন হয় বলেই আমরা খেলাধুলা করি। অনুরূপভাবে শিল্পকলাও আমাদের উদ্বৃত্ত শক্তির নির্গমনের এক প্রকার অভিব্যক্তি। এ যেন এক আত্মশক্তির খেলা বা লীলা, চিত্তবিনোদনের সর্বোচ্চ পথ।

শিল্পকলাকে এক ধরনের খেলা হিসেবে বিবেচনা করার ধারণাটির সূত্রপাত লক্ষ করা যায় ইমানুয়েল কান্ট-এর দর্শনে। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত কান্টের *The Critique of Judgement* গ্রন্থে শ্রম ও খেলার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনার উলে-খ পাওয়া যায়। এখানে কান্ট প্রস্তাব করেন যে, শ্রম অপেক্ষা খেলার সঙ্গে শিল্পের সাদৃশ্য সর্বাধিক। কারণ খেলা অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়, তার নিজের জন্যই প্রীতিকর বা মনোরম হয়ে থাকে। কান্টের এই প্রস্তাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রেডরিক শিলার[৫] পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ একটি নতুন তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এই তত্ত্বে তিনি দেখান যে, মানুষের শক্তি কীভাবে তার সজৃনশীল কল্পনার দ্বারা শিল্পকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শিল্পকলার মধ্যে মানুষের সৃজনশীল, বিচারশীল ও সংবেদনশীল প্রকৃতি একটি ঐক্যতান্ত্রিক সূত্রে গ্রথিত থাকে।

চার. চতুর্থ তত্ত্বটিকে শিল্পরসিক ও নান্দনিকেরা 'সমবেদনা হিসেবে শিল্প' (art as empathy) নামে আখ্যাত করেন। সম্প্রতি কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে শিল্পকলাকে সমবেদনা হিসেবে গ্রহণ করার ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক 'empathy' বা 'সমবেদনা' শব্দটি দিয়ে 'sympathetic motor attitude'কে নির্দেশ করেন, যাকে আমরা বলতে পারি সমবেদী অঙ্গ-সঞ্চালন বা চেষ্টার মনোভাব। এটি এক ধরনের প্রীতিকর বা মনোরম অনুভব, যা কোনো শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়। এ ধরনের অঙ্গ-সঞ্চালক মনোভাব বা পেশীর সংকোচন সম্প্রসারণের অস্তিত্ব কারো কাছে প্রামাণিক ও স্পষ্ট হয় যদি সে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার একজন অধিক আগ্রহী ও অনুরাগী দর্শক হয়। এ ধরনের একজন দর্শক যখন তার প্রিয় খেলাটি দেখে, তখন সে অধিকাংশ সময় ইতস্তত্তভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করে। খেলাটির অনুকুল-প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার পেশীর সংকোচন সম্প্রসারণ হয়। খেলাটি শেষ হওয়ার পর সে দৈহিক স্বস্তিবোধ করে। যখন আমরা একটি গান শুনি তখন একটি নির্দিষ্ট তাল ও ছন্দের প্রত্যাশা করার ঝোঁক থাকে। কখনও গানের সুর ও তাল অনুসারে আমরা হাতের আঙ্গুল বা পা নাড়াতে শুরু করি। আবার কখনও কখনও গুন গুন করে গানটি গাইতে আরম্ভ করে দিই। যখন আমরা কাউকে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যেতে দেখি, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে টেনে তুলে নেয়ার ঝোঁক থাকে, যার ফলে আমাদের পেশী সঞ্চালিত হয়। কখনও কারও মুখের ভঙ্গি দেখে আমাদের অনুরূপ ভঙ্গি করার প্রবণতা জাগে। যেমন : সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য কেউ মুচকি হাসলে, আমরাও তাকে মুচকি হাসি ফিরিয়ে দিই।

যদিও আমরা সাধারণত এই ধরনের পেশী-সঞ্চালন ও মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, কিন্তু যখন আমরা কোনো চিত্র বা ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণ করি, তখন সেগুলো যে সংঘটিত হয় তাতে কোনো সংশয় নেই। শিল্পের সমবেদনা তত্ত্ব অনুসারে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা এক ধরনের সমবেদনা বা সহানুভূতি। এটি এমন এক ধরনের অভিজ্ঞতা যা আমরা অর্জন করতে পারতাম যদি আমরা সেই পরিস্থিতিতে অংশ নিতাম, অথবা সেই কাজটি করতে পারতাম, যা আমরা দেখছি বা যা একটি শিল্পকর্মে প্রতিফলিত বা চিত্রিত হয়েছে। সহজ ভাষায় বললে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা হলো শিল্পকর্মে প্রকাশিত আবেগ ও অনুভবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মনোভাব। এভাবে, শিল্পের সমবেদনা তত্ত্ব আমাদের মনস্তাত্ত্বিক ও শরীরতাত্ত্বিক সঞ্চালন বা চেষ্টার প্রক্রিয়ার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে আকার-আকৃতি ও রেখা-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট সমবেদী সঞ্চালন ক্রীড়ার সম্বন্ধ স্থাপন করে। এক্ষেত্রে রেখার অভিমুখকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সর্বদা ও সাফল্যের তাৎপর্য বহন করে লম্বালম্বি উলম্বরেখা। যেমন : উঁচু মিনারকে বিজয় বা সম্মানের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। ইউরোপীয় সুউচ্চ গথিক কাঠামোর তোরণ মানসিক উৎকর্ষসাধক তাৎপর্য বহন করে। যখন আমরা একটি ধারাবাহিক উলম্বরেখার দিকে তাকাই, তখন তা আমাদের চোখ ও দেহকে উর্ধ্ব অভিমুখে ধাবিত করে। তির্যক রেখা আমাদের কর্ণ ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার রেখা, যেমন : আমরা বিখ্যাত কোনো খেলোয়াড়ের চিত্রে লক্ষ করি। আনুভূমিক রেখা প্রতিক্রিয়া বা উদ্বেগমূলক অবস্থার তাৎপর্যবাহী, এমনকি একে দ্রুতগতির প্রতীক হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

পাঁচ. এ তত্ত্বটিকে নান্দনিকেরা 'ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শিল্প' (art as communication) নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। নন্দনতত্ত্বের বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন যে, ভাবের আদান-প্রদানই শিল্পকলার কেন্দ্রীয় ও অপরিহার্য লক্ষ্য। শৈল্পিক স্পন্দন ও নান্দনিক প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হতে পারে ভাববিনিময়ের তাগিদ। তাঁদের তত্ত্বগুলোর পরিধি অনেক বিস্তৃত; এদের মধ্যে রয়েছে মরমিয় মতবাদ, যেখানে শিল্পকলাকে কোনো আদর্শ সত্তা, সার্বিক বা পরমসত্তার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়; এদের মধ্যে রয়েছে সেইরূপ তত্ত্ব, যেখানে শিল্পকলাকে আবেগের ভাষ্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এদের মধ্যে এমন তত্ত্বও রয়েছে, যেখানে শিল্পকলা সম্বন্ধে কোনো পরাতাত্ত্বিকতা দাবি করা হয় না।

যিনি মনে করেন যে তার এমন একটি অভিজ্ঞতা আছে, যা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি চিরন্তন সত্যকে অথবা তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাদানকে অনুধাবন করার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, তিনি তাঁর ওই অভিজ্ঞতা অন্যকে জানানোর তাগিদ অনুভব করেন। লিও টলস্টয় তাঁর *What is Art?* শীর্ষক কালজয়ী গ্রন্থে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শিল্পের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

মানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে কথিত বা লিখিত উক্তির দ্বারা বিনিময় করা যায় বলে, তা মানুষের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে তোলার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। শিল্পকলাও ওই ধরনের একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। শিল্পকলার সঙ্গে ভাষার পার্থক্য ও বিশেষত্ব কেবল এটাই যে, ভাষার মাধ্যমে আমরা যেখানে চিন্তা বিনিময় করি, সেখানে শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা বিনিময় করি অনুভব (Tolstoy, 1938 : 121)।

অনুভব এবং আবেগ হলো সংক্রামক। যখন আমরা কোনো আবেগের প্রকাশ দেখি বা শুনি, তখন তা আমাদের মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলার প্রবণতা সঞ্চার করে। অনেক সময় কেউ কোনো কিছু দেখে হাসে, আর অন্য একজন তাকে হাসতে দেখে হাসে। অনুরূপভাবে, আমাদের উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা, ভয়, সাহস, উৎসাহ, সংকল্প, সম্মান ও ভালোবাসা অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে টলস্টয় একই কালজয়ী গ্রন্থে বলেন :

যে অনুভবের অভিজ্ঞতা কোনো এক সময় কারও হয়েছে, তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, রেখা, রং, শব্দ বা বাচনভঙ্গি ইত্যাদি শিল্পগত মাধ্যমের দ্বারা তার নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা, আবার এই মাধ্যমের দ্বারা তার মধ্যে সেই অনুতাপের জাগ্রত হওয়া এবং অন্যের মধ্যে অনুরূপ অনুতাপের সঞ্চালন করা ইত্যাদি হলো শিল্পকলার কর্মকাণ্ড। এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত মানবিক ক্রিয়ারূপই শিল্প (Tolstoy, 1938 : 137-138)।

সি. জে. ডিউকাসও তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ওই গ্রন্থে তিনি বলেন :

ভাস্কর্য, গৃহনির্মাণ, কবিতা, উপন্যাস এবং আমরা যা নাট্যশালায়, বিচিত্রানুষ্ঠানে বা প্রদর্শনীতে দেখি ও শুনি, তাকেই কেবল শিল্প হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। এগুলো নিশ্চয়ই শিল্পকলা, কিন্তু এগুলো শিল্পকলার ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে আমরা জীবনে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজীবনই বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মে পরিপূর্ণ; একেবারে ঘুমপাড়ানি গান থেকে শুরু করে ঠাট্টামজা, ভণ্ডামি, গৃহসজ্জা, সাজসজ্জা, বাসনপত্র তৈরি, মিনার নির্মাণ, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি সর্বত্রই শিল্পকলার নিদর্শন লাভ করা যায়। এ সকল কর্মকাণ্ড শৈল্পিক ক্রিয়াপরতা। কিন্তু 'শিল্প' শব্দের সীমিত অর্থে আমরা ওইরূপ সব প্রকার মানবিক কর্মকাণ্ডকে শিল্প বলি না, কেবল ওই সকল কর্মকাণ্ডের সেইসব অংশকেই আমরা শিল্প হিসেবে বিবেচনা করি, যার ওপর আমরা এক বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করি (Ducasse, 1944 : 52-53)।

শিল্পীমাত্রই আবেগময় অনুভবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আন্দোলিত হন। তাঁরা সেই অনুভব অন্যের কাছে প্রদান করার জন্য এমন কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, যা ওই অনুভবের ধারক ও বাহক। শিল্পকলা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ভাষা। ডিউকাস মনে করেন যে, শিল্পকলা হলো মনোবৃত্তি, মেজাজ, হৃদ্যতা, আবেগ ও অনুতাপের ভাষা। তবে যে ভাষায় আমরা কোনো ঘটনা, মতামত, বিবরণ বা প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করি তা থেকে শিল্পের ভাষা ভিন্ন।

ছয়. শিল্পকলার এ তত্ত্বটিকে নান্দনিকেরা 'অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্প' (art as expression) নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকে বিবেচনা করায় তত্ত্বটি ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শিল্পকে বিবেচনা করার তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এদের পার্থক্য কেবল শিল্প রচনার অভিপ্রায়গত পার্থক্য। কোনো কোনো নান্দনিক মনে করেন যে, শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত গভীর ভাবাবেগ, অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞাকে প্রকাশ করি যা আমরা আমাদের সাধারণ ভাষা ও ভাবভঙ্গির দ্বারা পর্যাপ্তরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হই না। শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হলো, ওই ধরনের অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করা। অন্যের কাছে যা আদান-প্রদান করতে বা সমরূপ অনুভব জাগ্রত করতে সক্ষম হলো কী হলো না, তা একটি গৌণ ব্যাপার, যদিও অন্যান্য মানুষের মতো শিল্পীও সহমর্মিতা বোধ করেন।

শৈল্পিক স্পন্দন বা প্রেরণা যেমন কিছু জিনিসকে নির্বাচন করে তীব্রতর করে, তেমনি তা কিছু জিনিসকে উপেক্ষা ও বর্জন করে। শিল্পী এমন সব উপাদান, আকার ও গুণ খুঁজে পেতে চান যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত হবে। এরপর তিনি তাঁর দর্শক বা শ্রোতার মনোযোগ সেই দিকে আকর্ষণ করেন, সমাজকে তিনি জোর দিতে চান। কাজেই, একটি শিল্পকর্ম হলো শিল্পীর অনুপ্রেরণা, অনুরাগ, নির্বাচিত অভিরুচি ও মূল্যবোধের অভিব্যক্তি। তবে শিল্পী যে কেবল তাঁর নিজের অন্তর্দৃষ্টিকেই প্রকাশ করতে চান তা নয়, তিনি অন্যান্য মানুষের মধ্যে থেকে একটি সহমর্মী বা সমব্যথী প্রতিক্রিয়াও জাগ্রত করতে চান। এভাবেই তাঁর নিজের অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টিকে সামনে তুলে ধরেন এবং অন্যেরা তাঁর ওই মূল্যবোধে অংশগ্রহণ করে। শিল্প হলো একটি সামাজিক কর্ম, যা কেবল আমাদের ব্যক্তিত্বকেই বিকশিত করে না, সামাজিক গোষ্ঠীর সমস্যাগুলোকেও ঐক্যবদ্ধ করে।

ইতালির প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক ও প্রথিতযশা নান্দনিক বেনেডিটো ক্রোচে-র মতে, শিল্প হলো একটি প্রকাশিত স্বজ্ঞা (art is intuition that is expressed)। শিল্প অবশ্যই দৈহিক ঘটনা থেকে, উপযোগবাদীদের কর্ম থেকে, দৈহিক ক্রিয়া ও ধারণাগত জ্ঞান থেকে ভিন্ন হবে। যেসব তত্ত্বে শিল্পকলাকে দর্শন হিসেবে, ধর্ম হিসেবে, ইতিহাস বা বিজ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, তা এক ধরনের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। স্বজ্ঞা যতক্ষণ পর্যন্ত সংবেদনের স্তরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণমাত্র। যদি স্বজ্ঞাকে বাস্তব হতে হয়, সমাজজীবনের অংশরূপে কোনো ভূমিকা রাখতে হয়, তাহলে তার জন্য অবশ্যই একটি অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মাধ্যমের প্রয়োজন। আর শিল্পকলা হলো, স্বজ্ঞা প্রকাশের এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক ও নান্দনিকেরা শিল্পকে স্বজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করে, শিল্পকে তাঁরা অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে গেলেন। তাই এ তত্ত্ব কত দূর গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনার দাবি রাখে।

সাত. শিল্পকলার সর্বশেষ তত্ত্বটি শিল্পরসিক ও নান্দনিকদের কাছে 'অভিজ্ঞতার গুণধর্ম

হিসেবে শিল্প' (art as quality of experience) নামে পরিচিত। প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউঈ তাঁর *Art as Experience* শীর্ষক গ্রন্থে শিল্পকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং তাকে শিল্পসংগ্রহশালায় নির্বাসিত করার ব্যবস্থাগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, যে মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পকলার উদ্ভব হয় তাকে বাদ দিয়ে শিল্পকে সহজভাবে কিছু চিত্র, ভাস্কর্য বা সংগীত ইত্যাদির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। এভাবে শিল্পকলা পৃথক পৃথক কক্ষে বিভাজিত হয়, অন্যান্য মানবিক অভিজ্ঞতা থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র জগতে নির্বাসিত হয় এবং তাকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যুক্ত করে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে রাখা হয়।

প্রাচীনকালে শিল্পের সঙ্গে গৃহের বাসনপত্র, ধনুক, বল-ম, বর্শা, ব্যক্তিগত সাজসজ্জা ইত্যাদি সাধারণ বস্তুর অনুষঙ্গ ছিল। তখন শিল্প জীবনপ্রণালিকে উজ্জ্বল করে তুলত। ডিউঈ-র মতে, এখন আমাদের কাজ একে শিল্পকর্মের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলোর সম্বন্ধকে অব্যাহত রাখা। ডিউঈ বলেন, শিল্পকলা হলো একটি গুণধর্ম (quality) যা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই একে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্তগুণের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের সব ধরনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার নান্দনিক দিক রয়েছে। এই গুণ আমরা লক্ষ করতে পারি খেলোয়াড়ের সম্মান প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার মধ্যে, কর্তব্যরত গৃহবধূর পুলকিত অভিজ্ঞতার মধ্যে, অথবা কোনো যন্ত্রের নিখুঁত কাজকর্মের সন্তুষ্ট হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে। শিল্প যেমন অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে, তেমনি তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং তা থেকে নতুন একটি তাৎপর্যকেও নিষ্কাশন করে। মানুষের অভিজ্ঞতায় শিল্পকলার মান হলো কোনো সভ্যতার গতিশীলতার লক্ষণ। শিল্প হলো জীবনযাপনের মান এবং মহৎ জীবনোন্নয়নের একটি উপায়। এবার শিল্পকলার আলোচিত তত্ত্বগুলোর মূল্যায়ন করা যাক।

তত্ত্বগুলোর মূল্যায়ন

সমকালীন শিল্পতত্ত্বের শিক্ষার্থী মাত্রই লক্ষ করে থাকবেন যে, অনুলিপি তত্ত্ব শিল্পকলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না এবং সম্প্রতি এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তাও একেবারে শূন্যের কোঠায়। শিল্পের ক্ষেত্রে অনুলিপি মুখ্য ব্যাপার নয়, গৌণ ব্যাপার। যদি তা মুখ্য ব্যাপার হতো তাহলে ক্যামেরার রঙিন ছবিকেই সবচেয়ে নিখুঁত শিল্প বলতে হতো। একথা ঠিক যে, অঙ্কিত চিত্রকলা থেকে শুরু করে সংগীত, কবিতা, নির্মাণশিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি অনুলিপির উপাদান থেকে যায়। কিন্তু শিল্পকলার কাজ কেবল কোনো কিছু বর্ণনা করা বা নকল করাই নয়। কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার অনুলিপি হওয়ার সক্ষমতা শিল্পকলার একটি সঙ্কীর্ণ ধর্ম। প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়। এর বৈচিত্র্যময় রং ও গতিকে হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। শিল্পী যা দেখেন, যা তার

ভাবাবেগ ও অনুভূতিকে নাড়া দেয়, যা তার কাছে মর্মস্পর্শী আবেদন রাখে, তা তিনি চিত্রিত করেন, কিন্তু দুজন শিল্পীর অভিজ্ঞতা কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে না।

অধিকাংশ শিল্প অধিকাংশ লোককে সুখ দেয়। তাই শিল্প সুখ উৎপাদক। কিন্তু একেই শিল্পের পর্যাপ্ত মানদণ্ড বলা যায় না। কিছু শিল্পকর্ম, যেমন করুণ নাটক, সেই অর্থে খুব বেশি সুখ প্রদান করে না। যে শিল্পী একটি শিল্পকর্মের স্রষ্টা তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সুখ খুঁজে পান। কিন্তু অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও সুখ সহগামী হয়। তাই সুখের মানদণ্ড দিয়ে শিল্পকলাকে অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পৃথক করা যায় না।

খেলা হিসেবে শিল্পকলার তত্ত্বটিও বর্তমানে জনপ্রিয় কোনো তত্ত্ব নয়। এমনকি যদি এটাও দেখানো যায় যে, উৎসবের দিক থেকে শিল্পকলা খেলার সমতুল্য, তাহলেও শিল্পকলার বর্তমান মূল্যের বিচারে তাকে আবশ্যিকভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলা যায় না। অতিরিক্ত কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে কোনো কিছুকে কেবল তার উৎস দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এক ধরনের উৎসগত দোষ বা হেত্বাভাস (genetic fallacy)।[৭] এটি নিঃসন্দিগ্ধ যে, শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের মধ্যে শিল্পকলা জীবন থেকে পলায়নধর্মী বিষয় হিসেবে কাজ করে। আর এ কারণেই আমরা নাট্যশালায় যাই, সিনেমা দেখি, ছবি আঁকি, কবিতা ও উপন্যাস পড়ি ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও সত্য যে, ওই একই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ সমুদ্র অভিযানে যায়, মৎস্য শিকারে যায়, নিষিদ্ধ পানীয় পান করে, এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্তও করে বসে।

সমবেদনা তত্ত্বের মতো শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক ও শরীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় শৈল্পিক স্পন্দন বা প্রেরণার ওপর অধিক আলোকপাত করা হয়েছে, তাতে কোনো দ্বিমত বা সংশয় নেই। এই তত্ত্বে ওই প্রেরণাকে আমাদের ভাবের আদান-প্রদান ও অভিব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছে সেটাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু শিল্পের দর্শন হিসেবে সমবেদনা তত্ত্বের সম্পূর্ণতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। যদি একে সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হয়, তাহলে এর সঙ্গে অন্যান্য ব্যাখ্যার সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। একজন শিল্পী হতে পারেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে নতুন সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধ গুণাবলি লক্ষ করেন, যেখানে তা অন্যান্য মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কোনো মূল্যের ব্যাপারে একজন শিল্পী অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা বেশি সংবেদনশীল হতে পারেন এবং তার কল্পনাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিকে অন্য মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান করার চেষ্টা করতে পারেন।

ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে, অভিব্যক্তি হিসেবে এবং অভিজ্ঞতার গুণধর্ম হিসেবে শিল্পকলাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। এই তত্ত্বগুলোর প্রবর্তক ও প্রচারকেরা এগুলোকে পর্যাপ্তরূপে সম্পূর্ণ বলে মনে করেন। অনেক তত্ত্বই এ বিষয়ে

একমত যে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা একটি অনন্য বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতাকে তখনই মূল্যবান বলা যায়, যখন তা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। সৌন্দর্যের সন্ধান করা ও বৃদ্ধি করার মধ্যে এবং অন্যের কাছে নান্দনিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করার মধ্যে একটি দায়িত্ববোধ রয়েছে। যখন নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করেন যে, শিল্পকলা নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রধান উৎস নয় এবং শিল্পীরা প্রায়শই এমন লক্ষ্যবস্তুতে আগ্রহী যা নিয়ে নন্দনতত্ত্বের কদাচিৎ কিছু করার থাকে, তখন তারা শিল্পের দর্শনায়ন (Philosophics) সম্বন্ধে সংযমী হয়ে পড়েন। আর এই আলোচনাই আমরা পূর্ববর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কারুশিল্প এবং শিল্পকলার পার্থক্য সম্বন্ধে নিচের বিবৃতিগুলো থেকে শিল্পকলার গতানুগতিক দর্শনায়নের ওপর নিদারুণ অসন্তুষ্টি প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে মি. হিলিস কাইজার-এর বক্তব্য উদ্ধৃতির দাবি রাখে। কাইজার বলেন :

> craft বা কারুশিল্প শব্দটি এমন সব কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে যা একান্তই ওই কর্মকাণ্ডের জন্য নয়, বরং অন্য কোনো লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়। যেমন : কাঁথা সেলাই, সুয়েটার বানানো ইত্যাদি। অন্যদিকে art বা শিল্পকলা শব্দটি এমন কর্মকাণ্ড নির্দেশ করে, যা কেবল ওই শিল্পের জন্যই সম্পাদন করা হয়। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সম্পাদন করা হয় না। যেমন : বীণা বা সেতার বাজানো ইত্যাদি। কেউ যদি স্বীকার করেন যে, শিল্পকলার লক্ষ্য হলো ভৌত বস্তু ও আদর্শ বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করা, চিন্তা ও অনুভবের আদান-প্রদান করার শিক্ষা দেওয়া, চিন্তা ও কর্মে উদ্দীপিত করা, উপযুক্ত ভাবাবেগের সমৃদ্ধি সাধন করা, তাহলে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে কবুল করে নিচ্ছেন যে, শিল্পকলা এক ধরনের কারুশিল্পমাত্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের অধিকাংশ দার্শনিকতত্ত্বকে বাতিল করা যায় এই কারণ দেখিয়ে যে, সেগুলোতে শিল্পকলাকে কারুশিল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নান্দনিক উপলব্ধি পরিচিতিমূলক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত নয়। প্রকৃত শিল্পকলা হলো এমন একটি অভিব্যক্তি, যা তার নান্দনিক উপলব্ধি থেকে প্রাপ্ত সুখের জন্যই রচিত হয়ে থাকে। যা কিছু এ ধরনের স্বতঃমূল্য বিশিষ্ট নান্দনিক মূল্যের জন্য সৃষ্ট হয়, তা নন্দনতত্ত্ব জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে (Kaiser, 1952 : 41-49)।

আমাদের নান্দনিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতার গভীরতা ও পরিধিকে সম্প্রসারিত করার অর্থ হলো, আমাদের অনুভব ও জীবনের পরিধিকে একটি সমগ্র হিসেবে সম্প্রসারিত করা। নান্দনিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে সরিয়ে রাখার প্রবণতা থাকে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আত্মচেতনাকে অতিক্রম করে জীবনবোধ ও মূল্যবোধের একটি নতুন মাত্রা অর্জন করি। সত্যিই সৌভাগ্যবান সেই প্রখর সংবেদনশীল ব্যক্তি, যিনি দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সর্বদাই নান্দনিক সন্তুষ্টি খুঁজে পান। এ প্রসঙ্গে হান্টার মিড বলেন :

> প্রত্যক্ষমূলক অনুভব ও নান্দনিক সংবেদনশীলতার প্রতিনিয়ত ব্যবহারে আমাদের জীবন প্রকৃতই স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধশালী হয়। যেহেতু আমাদের অধিকাংশের পক্ষে উন্নত চিত্রকলা, ভালো সঙ্গীত ও সুন্দর দৃশ্যের সংস্পর্শে আসা সহজলভ্য নয়, সে কারণে নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে নিরাপদে রাখার মধ্যেই এর সুস্পষ্ট সমাধান নিহিত রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে উন্নত শিল্পকলা ও মনোরম দৃশ্যের জন্য শ্বাসরুদ্ধ তীব্রতায় শিহরিত হওয়ার মতো কদাচিৎ কিছু পাওয়া যায়। যেহেতু ব্যবহারিক ঘটনাপ্রবাহের চাপ প্রায়শই শক্তিশালী নান্দনিক ভাবাবেগের আনন্দকে নষ্ট করে না, সে কারণে এই সকল ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার গৌণ বৈশিষ্ট্যের কিছু সুবিধা রয়েছে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে যে তীব্রতা ও শিহরনের প্রভাব থাকে তা তারা পুষিয়ে দেয় তাদের সহজলভ্য ও ব্যাপক পরিস্থিতির সুবিধা থেকে। প্রখর সংবেদনশীলতার অধিকারী এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তাঁদের নান্দনিক পরিব্যাপ্তির প্রাচুর্যের বৃহত্তর সংকট খুঁজে পান দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাধারণ প্রণালির মধ্যে (Mead, 1952 : 140)।

শিল্প ও সংস্কৃতি

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা গেল, শিল্পকলা জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যাকে মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানুষ যা দেখে ও অনুভব করে, তার সঙ্গে মানুষ যা ভাবে ও জানে তার নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। নান্দনিক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিল্পকলার উদ্ভব। একটি শিল্পকর্ম অবশ্যই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের একটি অভিব্যক্তি, এবং যে যুগে এর উৎপত্তি তার দৃষ্টিকোণ বা আত্মশক্তির একটি প্রতিফলন। যে ক্ষেত্রে শিল্পী তাঁর পূর্ববর্তী শিল্পশৈলীর ধরনকে অনুকরণ বা নকল করেন, একমাত্র সেই ক্ষেত্রটি ছাড়া, এবং শিল্পকর্ম অবশ্যই তার সংস্কৃতির একটি অভিব্যক্তি হবে এবং একইসঙ্গে তা এই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও সহায়তা করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মধ্যযুগের শিল্পকলা হলো ওই যুগের ধর্মতাত্ত্বিক অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি। প্রতীচ্যে নবজাগরণের যুগে দেশ-কালিক জগৎ ও প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ বর্ধিত হওয়ার কারণে শৈল্পিক অভিব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। এক্ষেত্রে শিল্পীরা দৈনন্দিন জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। প্রতিকৃতি চিত্র (portrait painting)-এর ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে, সাধারণ বস্তুর স্থির চিত্র (still lifes) ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র (landscape)-এর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ওই বর্ধিত আগ্রহের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পরিবর্তিত আগ্রহ বৈচিত্র্যময় পথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের প্রতিচ্ছায়াবাদ (impressionism)-এর দিকে অগ্রসর হয় এবং জগৎ ও প্রকৃতিকে চিত্রিত করার নতুন এক দিশার সন্ধান পায়।

প্রতিচ্ছায়াবাদীরা যে জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন তার দিকে তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। নতুন কলাকৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা সেই যুগের শিল্পীরা তাঁদের লক্ষ্যে গতানুগতিক শিল্পকলার প্রভাব থেকে গত দুই দশক যাবৎ বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য সাধন করেননি। তাঁরা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন, সেভাবে তাকে অঙ্কন করার বাসনায় বিভিন্ন ধরনের নতুন কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। যেমন : অপ্রচলিত বর্ণ সমন্বয়, শিথিল তুলির চিত্র (loose brash work), দৃশ্যসংলগ্ন চিত্র (Painting on the spot), সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে চিত্র ইত্যাদি।

এসব চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। গত উনিশ শতক ছিল মহান আশাবাদ ও প্রসন্নতার যুগ, বিশেষভাবে প্রতীচ্য সমাজের উঁচু শ্রেণির পক্ষে। প্রকৃতির জগৎকেই শিল্পীর মনোযোগের মূল্যবান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যার প্রতিকৃতি তাঁরা চিত্রিত করবেন বিভিন্ন রূপ ও ভঙ্গিমায়। এ সময় থেকেই বহু সংখ্যক শিল্পী গতানুগতিক শিল্পশৈলীর ওপর অসন্তোষ ও অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন। এ সময়ের প্রতিচ্ছায়াবাদ ছিল দীপ্তিময় কিন্তু অপরিচ্ছন্ন বা অগোছালো। শিল্পবিপ্লবের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কারুশিল্পের পতন তরান্বিত হলে শিল্পীরা তাতে অসন্তুষ্ট হন। তখন নবীন শিল্পীরা পুরনো শিল্পশৈলী পরিত্যাগ করে নতুনভাবে শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করেন। চিত্রকলার বিষয় ও লক্ষ্য হিসেবে প্রকৃতির অনুলিপিকরণ শৈলীকে পরিত্যাগ করেন ভ্যান গঘ (Van Gogh) ও পল সেজাঁ (Paul Cezanne)-র মতো অনেক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট (Frank Loyed Wright) স্থাপত্যের ব্যবহারিক দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। গৃহের যে সমস্ত অংশ ও নকশার ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই তা তিনি অপসারণ করতে শুরু করেন। অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন ও উদ্ভাবন লক্ষ করা যায়।

পুরনো রীতির প্রতিটি অসন্তুষ্টি থেকে কুড়ি শতকের শিল্পকলা উদ্ভূত হয়েছে। এই বিদ্রোহ ছিল ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, নৈর্ব্যক্তিকীকরণ ও নিশ্চয়তার দাবির বিরুদ্ধে, যা সবচেয়ে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়েছে শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যদিও তা কেবল ওই বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকে ওই বিদ্রোহ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পুরনো আত্মবিশ্বাস বিদায় নিতে শুরু করে প্রগতির পথ থেকে, উনিশ শতকের দর্শন ও দৃশ্যতার মুক্ত প্রকৃতি থেকে। শিল্পী ও লেখকেরাই প্রথম পরিবর্তনের লক্ষণগুলো উপলব্ধি করেন এবং জরাজীর্ণ অব্যক্তিগত জগতের ধারণাকে অস্বীকার করেন। মানুষের মধ্যে বুদ্ধির উপরিতলগত অগভীর ভূমিকা ও গভীর নির্বিচারী মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এবং সমগ্রতাবাদী একদলীয় গণআন্দোলন ইত্যাদি অনেক কারণে তাঁরা আরও মোহমুক্তির দিকে এগিয়ে যান, বুদ্ধির ভূমিকা, মানবকল্যাণ ও পুরনো কাঠামোকে সাধারণভাবে অস্বীকার করেন।

প্রতীয়মান জগতের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদ বর্তমান দশকের অ-বস্তুনিষ্ঠ বিমূর্ত শিল্পকলায় প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ আধুনিক শিল্পকলাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে উপলব্ধিযোগ্য বস্তুর অভাব এবং অস্বাভাবিক অংশ বিন্যাসের ভাঙাচোরা আকার দিয়ে। উদ্ভট, খেয়ালী, অতিপ্রাকৃতিক ও মরমিয় প্রতীকের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। প্রতিটি শিল্পকলার মধ্যে জগৎকে পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিল্পকলায় সেই প্রচেষ্টা আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মনে হয় যেন শিল্পীরা আমাদের সমাজের দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে চিহ্নিত করতে ব্যস্ত। তারপর তাঁরা

জগৎকে সেইভাবে পুনর্গঠন করেছেন যেমনটা তাঁরা পছন্দ করেন। তবে বিশেষ কিছু শিল্পকর্মে চিত্তবৃত্তির প্রাধান্য থাকতে পারে।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা বিমূর্ত ও অ-বস্তুনিষ্ঠ শিল্পকলার দিকে ঝুঁকে পড়েন, যা লক্ষ করা যায় বস্তু ও ঘটনার দ্বারা উদ্ভাসিত আবেগের প্রতীককে ব্যবহার করে তাঁদের চিত্রকল্প তৈরি করার প্রচেষ্টার মধ্যে। অভিব্যক্তিবাদ এমন একটি প্রকৌশল, যাকে বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অভিব্যক্তিবাদীরা মুখোমুখি হতে চান দারিদ্র্য, দুঃখ, অধিকার হরণ ও কুৎসিত অবস্থাগুলোর দিকে। এসব সমস্যা সম্বন্ধে কোনো কোনো অভিব্যক্তিবাদী এতটাই উৎসুক বোধ করেন, যার ফলে তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ঐক্য ও সুন্দরের ওপর জোর দেওয়ার মনোবৃত্তি কেবল সৎ মানুষ হয়ে ওঠার অস্বীকৃতি থেকে জন্ম নেয়। বিমূর্ত শিল্পকলায় সব ধরনের বিষয়বস্তু বর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল রং ও রেখার দ্বারা কোনো ভাবাবেগ ও চিত্তবৃত্তিকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

কিউবিজম বা জ্যামিতিবাদী শিল্পকলার ক্ষেত্রে পিকাসো-র মতো শিল্পীরা অন্বেষণ করেছেন সারল্য ও আকার-আকৃতির ছন্দময় বিন্যাসক্রম। যেমন : বর্গাকার, কৌণিক ও নলাকার বস্তু ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আকারকে এবং বিষয়বস্তুকে গৌণ ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অধিবাস্তুবাদী বা সুররিয়ালিস্টরা ফ্রয়েড ও অন্যান্যদের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন সব স্বপ্নচিত্র ও প্রতীকী চিত্রের সন্ধান করেন যা ফ্রয়েডীয় ইদ Id-এর স্পন্দনের বিশৃঙ্খলাকে প্রকট করে তুলে ধরে। বহির্জগতের দিকে তাঁদের দৃষ্টিপাত নিরত হয়, এমনকি ভৌত প্রকৃতির ওপর তাঁরা তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁদের মনোযোগ ছিল মনের লুকায়িত গভীরতা অনুসন্ধানের দিকে।

অনেকের দ্বারা আধুনিক শিল্পকলার অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও বিশৃঙ্খলা হিসেবে যা ব্যাখ্যাত হয়েছে তা অবশ্যই কিছু দার্শনিক আন্দোলন ও আমাদের সময়ের বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক। সম্ভবত শিল্পকলা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছে। আর এটাই বলছে যে, আমাদের যুগ একটি ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খলিত প্রহেলিকার যুগ, যা খুঁজে পেতে চাইছে একটি অর্থ ও তাৎপর্যের দিশা। যখন আমাদের যুগ আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঐক্য অর্জন করেছে, তখন আশা করা যায় যে, শিল্পীরা ওই ঐক্যকে প্রকাশ করবেন। আর তাতেই প্রতিফলিত হবে নন্দনতত্ত্বের সার্থকতা। এ পর্যায়ে নন্দনতত্ত্বের ইতিবৃত্ত দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নন্দনতত্ত্বের ইতিবৃত্ত

নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সর্বাত্মক ধারণা লাভের প্রত্যাশায় এবার এর ইতিবৃত্তের প্রতি নজর দেওয়া যাক। আজ আমরা জ্ঞানার্জনের যে শাখাটিকে Aesthetics বা নন্দনতত্ত্ব বলে অভিহিত করছি তার উৎস নিহিত রয়েছে গ্রিক

চিন্ড্রধারায়। প্রাচীন কালের গ্রিক-দার্শনিকেরা প্রাথমিকভাবে মনে করতেন যে, নান্দনিকভাবে সংবেদনশীল বস্ড্রু নিজ গুণেই সুন্দর। পে-টো মনে করতেন, সুন্দর বস্ড্রু হলো তার অংশসমূহের সংঘবদ্ধ, ঐকতানিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা। এরিস্টটল সুন্দর বস্ড্রুর মধ্যে যে লক্ষণধর্ম খুঁজে পেয়েছেন তা হলো তাদের ক্রমবিন্যস্ড় সমরূপতা ও সুনির্দিষ্টতা। পে-টো ও এরিস্টটল কেউই বেসুরো, সামঞ্জস্যহীন ও বিশৃঙ্খল কোনো বস্ড্রু বা জিনিসকে সুন্দর বলে অভিহিত করেননি। তাঁদের উভয়ের আলোচনায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও সুন্দরের ধারণার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য লক্ষণীয়।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বিবর্তিত হয়েছে মানুষের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অবস্থার সূচনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং ওই অবস্থাকে প্রতীকায়িত করে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, আল-াহ্তা'আলার শিল্পকর্মের তুলনায় মানুষের শিল্পকর্ম নিকৃষ্ট। তাই কোনো মানুষ ও পশুর বাস্ড়বধর্মী চিত্রাঙ্কন করা মানে আল-াহতা'আলাকে অবমাননা করা। শিল্পকলা সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মের এই মত মুসলিম শিল্পীদের শৈল্পিক ও নান্দনিক সম্ভাবনাকে কতকগুলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমিত করে দিয়েছে। যেমন : মোজাইক, ক্যালিগ্রাফি, নির্মাণ শিল্প, জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণ এবং আলপনা অঙ্কন ইত্যাদি।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে চীনা দার্শনিকেরা নন্দনতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তা পরে স্ড়িমিত হয়ে যায়। কনফুসিয়াস মানব প্রকৃতিকে উদ্ধার করে তোলার ব্যাপারে শিল্পকলা ও মানবিকতার ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন (Zehou, 1994 : 69)। কিন্ড়ু, তাঁর সমসাময়িক দার্শনিক মজি (Mozi : 470-391) প্রচার করেন যে, সংগীত ও ললিতকলা হলো শ্রেণিবিভেদক ও অর্থহীন কর্ম, যা ধনাঢ্য ব্যক্তির সুবিধার জন্য সৃষ্ট। কিন্ড়ু, সাধারণ মানুষের জন্য নয়। প্রতীচ্যের মধ্যযুগীয় শিল্পকলা, অন্ড়ত নবজাগরণের সময় ধ্রুপদী আদর্শের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ড়, সর্বাধিক বা সর্বাত্মকভাবে ধর্মকেন্দ্রিক। চার্চ বা ক্ষমতাধর যাজক শ্রেণির ব্যক্তির দ্বারা মদদপুষ্ট, অথবা কোনো ধর্মনিরপেক্ষ ধনাঢ্য পৃষ্ঠপোষকের দ্বারা উৎসারিত। শিল্পের কাঠামোগত বিন্যাস ও সামঞ্জস্যের চেয়ে ধর্মীয়ভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার বাণীকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো। মানুষের কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে শিল্পীকে ঈশ্বরের উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই প্রতীচ্যের মধ্যযুগে স্বাধীন নন্দনতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেনি।

সতেরো শতকে প্রতীচ্য দর্শনে বহুল পরিমাণে পরিবর্তন সাধিত হলে, এ সময় বিশেষভাবে জার্মান ও ব্রিটিশ দার্শনিকেরা নান্দনিক অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্যকে শিল্পের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন, এবং তারা লক্ষ করেন যে, সৌন্দর্যই শিল্পের অপরিহার্য লক্ষ্য হতে পারে। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ফ্রেডরিক শিলার মনে করেন যে, মানুষের বৌদ্ধিক ও সংবেদ্য (sensual) অংশের যথার্থ সমন্বয় ঘটে সৌন্দর্যের

নান্দনিক বোধ ও উপলব্ধির মধ্যে (Shusterman, 1992 : 37)। হেগেল মনে করতেন যে, শিল্পকলা হলো প্রথম স্ড়র, যেখানে পরমসত্তা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে প্রকাশিত হয়। এভাবে সৌন্দর্যের আত্মগত নয়, বস্ড্রুগত প্রকাশ ঘটে শিল্পের মাধ্যমে। শোপেনহাওয়ার-এর কাছে সৌন্দর্যের নান্দনিক উপলব্ধি হলো আমাদের বিশুদ্ধ বোধশক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কার্যকর করার সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত ক্ষেত্রে।

ব্রিটিশ স্বজ্ঞাবাদীরা, যথা : তৃতীয় আর্ল অফ সফস্টবেরি, দাবি করেন যে, সৌন্দর্য হলো নৈতিক ভালোত্বের সমতুল্য সংবেদ্য ধর্ম। লর্ড কেমেস (Lord Kames : 1696-1782), উইলিয়াম হুগার্থ (William Hogarth : 1697-1764) এবং এডমান্ড বার্ক (Edmund Burke) প্রমুখ দার্শনিক ও নান্দনিকেরা সৌন্দর্যকে কতকগুলো গুণধর্মে পর্যবসিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে জেম্স মিল ও হারবার্ট স্পেনসার সৌন্দর্যের সঙ্গে কিছু মনোবিজ্ঞানের ও জীববিজ্ঞানের তত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্দীপ্ত হন।

তবে, প্রাচীন গ্রিসেই নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। এসময় জ্ঞানগুরু সক্রেটিস এবং তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য পে-টো প্রমুখ দার্শনিকেরা বস্ড্রুত সৌন্দর্য ও তার অন্ড়র্নিহিত ধর্মের ওপর আদ্যতা প্রদান করেন। তাঁরা শিল্পকলার সমালোচনা এবং পরিকল্পনাকেও নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন। নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ aesthetics শব্দটির উৎপত্তি হয় গ্রিক শব্দ aisthanomai থেকে, যার অর্থ হলো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। অনুরূপভাবে, আধুনিক ইংরেজি ভাষায় শব্দটি নামপদ হিসেবে গণ্য হয়, যার অর্থ হলো কোনো কিছুর দ্বারা ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা উৎপন্ন হওয়া। যেহেতু শব্দটির অর্থ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল, সে কারণে এর সংজ্ঞার্থ বৈচিত্র্যময়, কালপ্রবাহে ব্যাপকভাবে পরিবর্ধিত, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও মানুষের কাছে বিভিন্ন এবং মূলত আত্মগত।

অধিক সাধারণ অর্থে, দর্শন হিসেবে নন্দনতত্ত্ব হলো সংবেদ্য মূল্যের অধ্যয়ন। এর অর্থ হলো, ইন্দ্রিয় অনুভবের দ্বারা মূল্যায়ন ও অবধারণ। পরবর্তী সময়ে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচারমূলক সমালোচনা বা দার্শনিক চিন্ড়া[৮]। মূল্যবিদ্যার শাখা বা শিল্পকলার দর্শন হিসেবে নন্দনতত্ত্ব জগৎকে দেখা ও অনুভব করার ভঙ্গির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটি শাস্ত্র হিসেবে নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে জগৎকে দেখার ভঙ্গি ও প্রত্যক্ষ করার ভঙ্গিও অন্ড়র্ভুক্ত। সমসাময়িক অর্থে, একটি বিশেষ ধরনের শৈলী ও নকশা বা পরিকল্পনাকে নির্দেশ করার জন্য নন্দনতত্ত্বের শব্দকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন : বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিম-লে বিভিন্ন ধরনের শৈলী, নকশা, সুর ও কাঠামো অনুসরণ করা হয়। এই ধরনের শৈলী ও কাঠামো বিশিষ্ট বস্ড্রুকেই মানুষ সুন্দর মনে করে, প্রশংসা করে এবং এভাবেই নান্দনিক মূল্যকে কবুল করে নেয় (Beardsley, 1958 : 101)।

বিচারমূলক শাস্ত্র হিসেবে নন্দনতত্ত্বে একদিকে যেমন সংবেদনের স্ড়রে একটি বোধশক্তি বা অবধারণ-সামর্থ্যের অস্ড়িত্বকে পূর্ব থেকে কবুল করে নেয়, তেমনি সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সমষ্টিগত ঐকমত্যকেও অঙ্গীকার করে নেয়। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট একজন ব্যক্তির কাছে বস্ড়ুর সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সামর্থ্য এবং বহু ব্যক্তির সমষ্টিগত সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য করেন। কারণ, সৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গৃহীত একটি ধারণাও কারও কাছে স্বীকৃত নাও হতে পারে। কান্টের বিশে- ষণে, নিছক মতামত অপেক্ষা সৌন্দর্য একটি অধিক বাস্ড়ব গুণ। কান্ট স্পষ্টভাবেই এখানে সৌন্দর্যকে একটি বাস্ড়ব গুণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে নন্দনতত্ত্বের ইতিবৃত্তে একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করলেন।

নন্দনতত্ত্বের এ ধরনের দার্শনিক আলোচনা আমাদের আরও অতীতে পে- টোর মতবাদের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে মনে করা হতো যে, সংবেদ্য সৌন্দর্য বিশিষ্ট সকল বস্ড়ু হলো তাদের বস্ড়ুজাত নিখুঁত আদর্শাকারের নকল বা অনুলিপি মাত্র। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রত্যেকটি বস্ড়ু যা কোনো শ্রেণি বা জাতির অন্ড়র্গত, যথা : ফুল, ফল, মানুষ, পাথর ইত্যাদি, তাহলো তাদের আদর্শস্বরূপ আকারের নকল, যা কেবল ধারণার মধ্যেই
অস্ড়িত্বশীল। বিশেষ বিশেষ বস্ড়ু তাদের আদর্শ আকারের পূর্ণতার দিকে যত অগ্রসর হবে তারা তত বেশি নান্দনিকভাবে সুখ প্রদায়ক হবে।

কান্ট যখন বলেন, একজন মানুষ যুক্তিতর্কের দিকে যাবে না, যদি তাকে অন্য কেউ বলে যে, কোনো কিছু তাকে সুখ দিচ্ছে তার নিজস্ব স্বরূপের কারণে নয়, বরং তার ফলাফলের কারণে, তখন তিনি নান্দনিক অবধারণ বা বিচারের বৈশিষ্ট্যের দিকটির মর্মবস্ড়ুকে তুলে ধরেন। কান্টের মতে, অন্য জিনিসের মতোই নান্দনিক মূল্যের সত্যতাও সৌন্দর্য বস্ড়ুর মধ্যে থাকে না, তা থাকে আমাদের সংজ্ঞার্থের মধ্যে। এর অর্থ হলো, গোলাপ স্বরূপত সুন্দর নয়, এটি সুন্দর হয়ে ওঠে যখন আমরা তাকে সুন্দর বলে দেখি ও বিবেচনা করি, যখন সমাজ তাতে সাধারণভাবে একমত হয়। কাজেই, কান্টীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বস্ড়ুর সৌন্দর্য আসলে একটি সত্যের উপলব্ধি, যা একই সঙ্গে সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত উভয়ই (Gyuyer, 1982 : 89-90)।

কোনো কোনো দার্শনিক একটি মানদ — নির্ধারণের চেষ্টা করেন, যা দিয়ে সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করা যাবে। এডমান্ড বার্ক এবং উইলিয়াম হুগার্থ প্রমুখ বিশে- ষণী চিন্ড়াবিদও প্রস্ড়াব করেন যে, সৌন্দর্যের ছয়টি মুখ্য সূত্র রয়েছে। যথা : শৈলী সূত্র, বৈচিত্র্য সূত্র, একরূপতা সূত্র, সারল্য সূত্র, সান্নিধ্য সূত্র এবং গুরুত্ব সূত্র। একুশ শতক ও উত্তরাধুনিক তত্ত্ব নান্দনিক মূল্যের দিকে এক নতুন মনোভাবের অবতারণা করে। উত্তরাধুনিক তত্ত্ব এই প্রাকস্বীকৃতির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সৌন্দর্য। শিল্পকলা যা বলতে চায়, তাতে ওই তত্ত্ব আগ্রহী নয়, বরং তার আগ্রহের বিষয় হলো শিল্পকলার আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা। এই অর্থে, উত্তরাধুনিক তত্ত্ব নন্দনতত্ত্বকে তার মূলের দিকে ফিরিয়ে এনেছে, যেখানে সংবেদ্য ধর্মটাই মুখ্য বিষয়, যেখানে নান্দনিক অভিজ্ঞতার গভীরতাকে খুঁজে পাওয়া যায় স্বরূপত অভিজ্ঞতার মধ্যেই এবং যেখানে সর্বজনীন নান্দনিক কর্ম ও শিল্পকর্মের দার্শনিক বিশে- ষণের গুরুত্ব নেই।

সত্তার তাত্ত্বিক উপাখ্যান অপেক্ষা সত্তার অবস্থা ও শর্তসমূহের দিকে উত্তরাধুনিক নন্দনতত্ত্ব বেশি আগ্রহী। এর পরিণামস্বরূপ, উত্তরাধুনিক শিল্পকলা শৈলীতে অপ্রত্যাশিতভাবে অতি পরিচিত বস্ড়ু ব্যবহৃত হয়। নান্দনিক অভিজ্ঞতায় সেই ব্যাখ্যাকেই উৎসাহিত করা হয়, যা আকারের উপাখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। দৃষ্টান্ড়স্বরূপ : যেহেতু পে- টোর আকারতত্ত্ব অনুসারে, একটি চেয়ারকে চেয়ার বলা যায় চেয়ারের আদর্শ আকারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকার কারণে, সে কারণে উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, যার ওপর বসা যেতে পারে তাকেই চেয়ার বলা যায়। এভাবে যা বিশেষ একটি কর্ম-প্রক্রিয়া নির্বাহ করে এবং গতানুগতিকভাবে যাকে চেয়ার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা বহু উপায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন : জামাকাপড় রাখার আলমারি হিসেবে, মই ও বই রাখার তাক হিসেবে ইত্যাদি। এভাবে আকারের ধারণাকে ও একবাচক নান্দনিক অবধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধকে আরও জটিল করে তোলা হয়।

মেসোপটেমিয়া, পারস্য, চীনা, ভারতীয়, রোমান, মিশরীয় ও গ্রিক ইতিহাসের মহান সভ্যতাগুলোতে একেকটি বিশেষ অনন্য প্রকৃতির শিল্পশৈলী ও নকশার কেন্দ্রীয় স্থান ছিল, যাদের প্রভাব রয়েছে আধুনিক শিল্পকলা ও সমসাময়িক নান্দনিক দর্শনের ওপর। বিভিন্ন স্থানে কালপ্রবাহে মানুষের দৈহিক কাঠামোর শৈল্পিক উপস্থাপনের মধ্যে নান্দনিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রাচীন গ্রিসের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মানুষের আকার, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের একটি কালহীন মডেল প্রদান করে (Adorno, 1984 : 118)। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমানুপাত, পেশীতন্ত্র ও যথাযথ উপস্থাপনকে একটি অপরিবর্তনীয় পটভূমিরেখা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে শিল্পী ও শিল্প যুগকে অনুকরণ করা থেকে বিরত হয়ে ব্যাখ্যা করার দিকে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। মানুষের আকারের উপস্থাপনে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নান্দনিক সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন দেহের লোম ইত্যাদি প্রায়শই বর্জন করা হয়েছে লোমহীনতার প্রায় সর্বজনীন অভিরুচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মুখম —লের অভিব্যক্তির উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু নান্দনিক গুণের সর্বজনীনতা লক্ষ করা যায়। সহজাতভাবে আদিম বা প্রবৃত্তিগত স্ড়রের ওপর মানুষ কিছু নান্দনিক অবধারণ প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কিছু জিনিস সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার কারণ হয় (Vander, 1963 : 37)। যেমন : বিরক্তিকর বা সুখ প্রদায়ক বস্ড়ু, যা সর্বজনীন মনুষ্য পরিপ্রেক্ষণের তত্ত্বকে সমর্থন প্রদান করে।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষই এসব গুণকে স্বীকার করে নেয়। অনেকটা প্রাকস্বীকৃতি হিসেবেই মানুষ এসব নান্দনিক গুণকে কবুল করতে বাধ্য হয়।

সাংস্কৃতিক আদর্শ ও সামাজিক মূল্য অবশ্যই স্বীকৃত নান্দনিক অবধারণকে প্রভাবিত করে। শিল্পকর্মের মধ্যে সামাজিক প্রত্যাশাকে প্রকাশ করে নারী রূপের বহুঅবতার লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে ও যুগে, সুঠাম, সুগঠিত ও প্রশস্ড় শরীরকে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সমস্ড় চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে, একজন নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন শক্তি সম্বন্ধে অবহিত করা হয় তার আদর্শ আকারকে চিত্রিত করে, যা তার সম্মান এবং মর্যাদাকেও জ্ঞাপন করে। অন্যান্য যুগ ও সংস্কৃতিতে, নারীর আকারকে হালকাপাতলা ও তন্বীরূপে সর্বাধিকভাবে অঙ্কন করা হতো ভিন্ন কোনো সময়ে তার সম্মান ও সমৃদ্ধিকে নির্দেশ করার জন্য (Sibley, 2001 : 147)। দৈহিক সৌন্দর্য অবশ্য স্থানীয় সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উত্তরাধুনিক যুগে দর্শন হিসেবে নন্দনতত্ত্বকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখন অনেকেই সৌন্দর্য ও শিল্পকলা বিষয়ক সর্বাধিকভাবে স্বীকৃত প্রধান তত্ত্বগুলোকে কবুল করতে চান না। যাই হোক, একটি শাস্ত্র হিসেবে নন্দনতত্ত্বের অর্থ, সৌন্দর্য এবং স্বরূপ নিয়েই একটি ধারাবাহিক আলোচনা চলতে থাকবে।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নান্দনিক মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়, যা লালিত-পালিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তির দ্বারা। ভারতবর্ষে নান্দনিক মূল্য বিবর্তিত হয়েছে একটি আধ্যাত্মিক ও পরাতাত্ত্বিক প্রতিরূপ এবং ধর্মীয় মূর্তিকলার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। এখানে শিল্পকলা এবং দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার স্বরূপকে প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি দিয়ে। যেমন : চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য, কাব্য, নৃত্য, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতের মহিমা দিয়ে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক উপাখ্যান ও আখ্যানকে বারবার চিত্রিত করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকলা ও জীবনপ্রণালির মধ্য দিয়ে এবং ওই সমস্ড় উপাখ্যানে জীবন ও প্রেমের সাদৃশ্য সিক্ত হয়েছে নান্দনিক সৌন্দর্যের মহিমায় (Sengupta, 1971 : 23)। চৈনিক ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব ছিল আরও সৌন্দর্য অনুসন্ধানের সাক্ষীবাহী। কনফুসিয়াস নিজেকে মানবপ্রকৃতি ও শিল্পকলার অধ্যয়নে উৎসর্গ করেন। পরিণামস্বরূপ, ধ্রুপদী চৈনিক শিল্পকলাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বের দর্শন ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হতে দেখা যায় (Zehou, 1994 : 38)।

ইসলামিক শিল্পকলার ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে, প্রতিরূপাত্মক শিল্পকলার সৃষ্টি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বিতর্ক রয়েছে। যারা বস্ড়ুর শৈল্পিক প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরোধিতা করেন তাঁদের যুক্তি অনুসারে, পরমস্রষ্টা আল-াহতা'আলা যেহেতু সবকিছু নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন, সে কারণে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট তার নকল প্রতিকৃতি অযথার্থ ও অবমাননাকর। এর ফলে দেখা যায়, অধিকাংশ ইসলামিক শিল্পকলা অ-প্রতিরূপাত্মক। যেমন : মোজাইক, মসজিদ

ও ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদি, যেখানে শৈল্পিক ও নান্দনিক প্রবণতা বিকশিত হতে পারে ধর্মতাত্ত্বিক রীতিনীতিকে অমান্য না করে (Leaman, 2004 : 88)। এর বিপরীতে, অনেক প্রতীচ্য ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্ড়ুর অনুকরণে আনুগত্য স্বীকার, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও উপাসনা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। বহু মহান শিল্পী অতিবর্তী জগৎকে মহিমান্বিত করে ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা, স্বর্গ ও নরককে তাঁদের শিল্পকর্মের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন।

নন্দনতত্ত্ব যখন ঐতিহ্যগতভাবে শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের বিচারমূলক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত তখন আকর্ষণ ও আবেদনের প্রয়োগ মানবজীবনের অনেক অংশে কার্যকর হয়। যেহেতু নান্দনিক গুণ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয়, সেকারণে একটি সুখ প্রদায়ক পরিবেশ মানুষকে অবচেতনভাবে যে প্রভাবিত করে তা বলাই যায়। আধুনিক শিল্পকারখানার উদ্ভব হলে মানুষ আরও সহজ জীবনধারা উপভোগ করার সুযোগ পায় এবং জীবনের বহু সমস্যার বিশেষ কোনো দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের প্রতি তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই, আধুনিক জীবনের সর্বত্রই নন্দনতত্ত্ব সক্রিয়। দৈনন্দিন জীবনে আপাতদৃষ্টিতে সকল হস্ড়নির্মিত বস্ড়ু থেকে শুরু করে আত্মগরিমা প্রকাশক স্থাপত্য পর্যন্ড় সর্বত্রই। আধুনিক বাচনভঙ্গিতে শিল্পকলার দর্শনের ওইরূপ ব্যবহারিক পরিবেশনাকে ফলিত নন্দনতত্ত্ব হিসেবে প্রায়শই নির্দেশ করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতের মতো ফলিত নন্দনতত্ত্বেও ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার পরিভাষাকে অনুবাদ করা হয় প্রতীকী আকারে।

আধুনিক প্রতীচ্য সমাজে অধিক সাফল্যের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বকে বিজ্ঞাপনের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। যে চিত্রে বিলাসবাহুল্য, সাফল্য ও প্রাচুর্য প্রকাশিত হয়, তা গণমাধ্যমগুলোতে আধিপত্য বিস্ড়ার করে এবং তাতে প্রস্ড়াব করা হয় যে, যদি ক্রেতা ওই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত দ্রব্যটি ক্রয় করে তাহলে সে একটি কাঙ্ক্ষিত জীবনধারা উপভোগ করবে। এই আধুনিক সভ্যতায়, যৌনতা হলো আরও একটি উচ্চ চাহিদার বাজারজাত নান্দনিক পরিষেবা। বাজারজাত দ্রব্য ও পরিষেবার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিহীন কোনো সুন্দর নারী মানুষের ছবি বিজ্ঞাপনের জন্য খুব কার্যকর হতে পারে। ভবন ও গৃহনির্মাণ এবং নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমরূপকতা প্রকাশক সৌন্দর্যের প্রয়োগ অতি সাধারণ। মানবজীবনের সমস্ড় ইন্দ্রিয় অনুভবের দিককে বিবেচনা করে সমসাময়িক শহর পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিকল্পনা, সবক্ষেত্রে নান্দনিক দৃষ্টি বিদ্যমান। এদিক থেকে আধুনিক পরিকল্পনায় নগরের পরিকাঠামো, গৃহ ও উদ্যানের ব্যবহারিক উপযোগিতার চেয়ে বেশি কিছুতে আগ্রহ প্রকাশিত হয় (Berleant, 1992 : 4)। অর্থাৎ, আমরা এদের সুগঠিত কাঠামোগত বিন্যাসের দিকেও আগ্রহী, এর সঙ্গে আমাদের পরিবেশের মধ্যে তাদের তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির দিকেও আমরা আগ্রহী।

মানবাভিজ্ঞতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নন্দনতত্ত্ব, অন্তত পক্ষে শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ হিসেবে, কেউ দর্শন হিসেবে কোনো নন্দনতত্ত্বের উদ্ভাবন করুন বা না-করুন, আমরা প্রায়শই সুন্দর বস্তুর সম্মুখীন হই এবং তাকে সুন্দররূপেই প্রত্যক্ষ করি। সমসাময়িক নন্দনতত্ত্বে একটি সার্বিক ও সর্বজনীন নিয়মকে স্বীকার করা হয় না এই যুক্তিতে যে, শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই, বরং পর্যবেক্ষণের দ্বারা তারা যে মুহূর্তে প্রত্যক্ষিত হয়, সেই মুহূর্তেই তাদের উভয়কে পাওয়া যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, সৌন্দর্য ও অভিরুচির আধ্যাত্মিক অধ্যয়নকে বোঝানোর জন্য 'aesthetics' শব্দটির বানানকে 'esthetics' রূপেও উলে-খ করা হয়ে থাকে। এটি শিল্পকলার দর্শনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, যেখানে শিল্পকলার স্বরূপ এবং সেই সমস্ত প্রত্যয় আলোচিত হয়, যার দ্বারা বিশেষ কোনো শিল্পকর্ম ব্যাখ্যাত ও মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

নন্দনতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। এটাও বলা যেতে পারে যে, আত্ম-সংজ্ঞা (self-definition) দেওয়া আধুনিক নন্দনতত্ত্বের এক প্রধান কাজ। আমরা একটি প্রহেলিকাপূর্ণ ও আগ্রহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার পরিম-লের সঙ্গে পরিচিত : এ যেন এক সুন্দর, কুৎসিত, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট বিষয়ের পরিম-ল, অভিরুচি, সমালোচনা, ললিতকলা ও এদের উপলব্ধি, সংবেদ্য উপভোগ, আকর্ষণ প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে, এদের মধ্যে একই সূত্র কাজ করে এবং একই ধরনের অনুরাগ বিদ্যমান থাকে। যদি আমাদের ওই বিশ্বাস ভুল হয়, তাহলে সৌন্দর্য ও সুরুচির ধারণাকে বাতিল করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে যা পড়ে থাকবে তা কেবল একটি প্রান্তিক আধুনিক কৌতূহল মাত্র। যদি আমাদের এই বিশ্বাস ঠিক হয় এবং দর্শন তার সমর্থন যোগান দেয়, তাহলে আমরা একটি দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হব (Sporshott, 1982 : 127)। এ পর্যায়ে নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক।

নন্দনতত্ত্বের পরিধি

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো, শিল্পদর্শন ও নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ ও লক্ষণধর্মকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা এবং এর অন্তর্নিহিত মূল্য ও বিষয়বস্তুর একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপরেখা প্রণয়ন করা। দর্শনের শাখা হিসেবে নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ এবং আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে তার লক্ষণধর্মের অনুপুঙ্খ আলোচনাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে এখানে একথাও বলে রাখা আবশ্যক যে, যদিও বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় পটভূমিতে রয়েছে প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব ও তার বিকাশ, তারপরও এখানে মার্কসবাদী এবং প্রাচ্যের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যেরও সমীক্ষা করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে কেবল নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে একটা সর্বাত্মক ধারণা লাভের লক্ষ্যে।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিষয়বস্তু ও পরিধির বিচারে নন্দনতত্ত্ব শিল্পদর্শন অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। শিল্পদর্শনকে নন্দনতত্ত্বের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কেবল শিল্পকলার মূল্য ও স্বরূপ নয়, এর সঙ্গে প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো তাদের অভিব্যক্তি খুঁজে পায় সুন্দর ও কুৎসিত ভাষার মধ্যে। কিন্তু শিল্পদর্শনে কেবল শিল্পের স্বরূপ, মূল্য ও নিহিতার্থ নিয়েই আলোচনা করা হয়। প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া শিল্পদর্শনে আলোচিত হয় না। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, সুন্দর ও কুৎসিত শব্দ দুটি প্রয়োগের দিক থেকে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত এবং অর্থের দিক থেকে আত্মগত হওয়ার কারণে তাদের প্রয়োগ দিয়ে 'সুন্দর' এ 'কুৎসিত' এই শ্রেণির বস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় কি-না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। কারও কাছে যে কোনো বস্তুই সুন্দর দেখায়, অথবা একটি দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোনো বস্তুকেই সুন্দর বলা যায়। কেউ কেউ 'সুন্দর' শব্দটি অতুলনীয় বা বিসদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এই কারণে যে, তাতে কদাচিৎ কিছু সাধারণ ধর্ম থাকে, অথবা একেবারেই থাকে না। হতে পারে তাদের সমস্ত মূল্যায়ন ও অবধারণ একটি মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমনও হতে পারে যে, 'সুন্দর' পদটির আদৌ কোনো অর্থ নেই, এটি কেবল একটি মনোভাবের অভিব্যক্তি, যা বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বস্তুস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়। 'সুন্দর' শব্দটির আদৌ কোনো অর্থ আছে কি-না, এ প্রশ্নও নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য সূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শিল্পদর্শন এ নিয়ে আলোচনা করে না।

দার্শনিকেরা 'সুন্দর' ও 'কুৎসিত' শব্দ দুটির ওপর জোর দিলেও তা শিল্পকলার আলোচনা ও সমালোচনার জন্য, অথবা প্রকৃতির যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করে তার বর্ণনার জন্য সর্বাধিকভাবে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ কি-না, তা স্পষ্ট নয়। কবিতার ক্ষেত্রে যা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ তাকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কবিতাটি বিদ্রূপাত্মক, গতিশীল, ভাবপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ছন্দোময়, অথবা ঐকতানিক ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, দেশের কোনো অঞ্চলকে আমরা 'সুন্দর' না বলে এভাবে বর্ণনা করতে পারি : জায়গাটি নির্জন, শান্তিপূর্ণ, স্নিগ্ধময়, স্বাস্থ্যকর অথবা উদ্দীপনাময় ইত্যাদি। অন্তত পক্ষে যা বলা যায় তা হলো, সুন্দর শব্দটি একশ্রেণির শব্দসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে তাকে বেছে নেয়া হয় অধিক সুবিধার জন্য, যাতে তা কোনো-না-কোনো অর্থে ওই শ্রেণির বিশেষত্বকে নির্দেশ করতে পারে। একইসঙ্গে, ওই শ্রেণির সীমা নির্দেশ করার কোনো স্পষ্ট উপায় নেই বলেই মনে হয়। এমনকি এর কোনো সুবিধাজনক তত্ত্বের কথাও উলে-খ করা যায় না। কাজেই, নন্দনতত্ত্ব তার জাল বিস্তার করে কেবল সৌন্দর্যের বা নান্দনিক প্রত্যয়গুলোর অধ্যয়ন অপেক্ষা আরও বিস্তৃত পরিধির ওপর। তাই শিল্পদর্শন অপেক্ষা নন্দনতত্ত্বের পরিধি সুবিশাল। সুন্দর-অসুন্দর, শিল্প-অশিল্প, সুরুচি-অরুচি, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সবই নন্দনতত্ত্বের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আমরা এখানে আবার প্রত্যাবর্তন করি সেই বিব্রতকর প্রশ্নে : সৌন্দর্য ও অভিরুচির ধারণাকে

সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হলে দার্শনিকদের কোন বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে? আর এটি জানা গেলেই নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও বিষয়বস্ড়ু সম্পর্কে আমাদের অসম্পূর্ণ ধারণাটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার দাবি করতে পারে।

এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য তিনটি সাধারণ প্রস্ড়াব বিবেচনা করার সুপারিশ করেন নান্দনিকেরা। এক. নান্দনিক প্রত্যয়গুলোর অধ্যয়ন, আরও বিশেষভাবে 'সমালোচনার ভাষার' বিশে-ষণ, যেখানে বিশেষ বিশেষ অবধারণগুলো নির্দেশিত হয় এবং তাদের যুক্তি ও যুক্তিযুক্ততা প্রকাশিত হয়। এডমান্ড বার্ক তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থে (Burke, 1963 : 101) দুটি ভিন্ন নান্দনিক প্রত্যয় ও তাদের দ্বারা নির্দেশিত গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য করেন, যাতে তাঁর লক্ষ্য ছিল ওই প্রত্যয়গুলোর অভিমুখী ভিন্ন ধরনের মানবিক মনোভাবের বিশে-ষণ প্রদান করা (Beardsley, 1958 : 139)। এই দুটি প্রত্যয় হলো 'মহত্তম' ও 'সুন্দর'-এর প্রত্যয়। বার্কের উলি-খিত দুটি নান্দনিক প্রত্যয়ের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবশালী, যেখানে সমসাময়িক সমালোচনার আধুনা প্রচলিত শৈলীও প্রতিফলিত হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক সময়ে, দার্শনিকেরা আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রত্যয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। যেমন : প্রতিরূপ, অভিব্যক্তি, আকার, শৈলী, সংবেদনশীলতার প্রত্যয় ইত্যাদি। এর দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। ১. কীভাবে ওই বর্ণনাগুলো যুক্তিযুক্ত হতে পারে তা দেখানো এবং ২. মানুষের অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র বা অনন্য ধর্মটি কী, যাতে ওই বর্ণনাগুলোর স্বরূপ প্রকাশিত হয় তা দেখানো। এসবই নন্দনতত্ত্বের পরিধিকে আরও বিস্ড়ৃত করেছে।

দুই. প্রতিক্রিয়া, মনোভাব ও ভাবাবেগ ইত্যাদি মানসিক অবস্থার দার্শনিক অধ্যয়ন নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এসবের ধারাবাহিক এবং প্রণালিবদ্ধ আলোচনাও নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও আলোচ্যসূচির অন্ড়র্ভুক্ত। এভাবে, আধুনিক নন্দনতত্ত্বের ওপর কালজয়ী ও সুদূরপ্রসারী *The Critique of Judgement*-এর মধ্যে ইমানুয়েল কান্ট 'বিচারশক্তি' বা 'faculty of judgement'-এর স্বতন্ত্র নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেন, যার দ্বারা আমরা বস্ড়ুর দিকে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছাড়াই (Crawford, 1974 : 138)। কাজেই নান্দনিক লোকের মূল চাবিকাঠি হলো নির্দিষ্ট একটি আসক্তিবিহীন মনোভাব, যা আমরা কোনো বস্ড়ুর অভিমুখে পোষণ করি এবং যাকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করতে সক্ষম। নান্দনিক আলোচনায় এ বিষয়টির ওপরও আদ্যতা প্রদান করা হয়।

সম্প্রতি দার্শনিকেরা কান্টের নন্দনতত্ত্বে অনাস্থা জ্ঞাপন করে 'নান্দনিক মানোভাব' ও 'নান্দনিক অভিজ্ঞতা'-র ধারণাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা আস্থা রাখেন হেগেলীয় ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত দার্শনিক মনস্ড়ত্ত্ব, প্রতিভাস-বিজ্ঞান এবং উত্তরপর্বের ভিটগেনস্টাইন-এর তত্ত্বের ওপর। এই তত্ত্বগুলো বিবেচনার ক্ষেত্রে

একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য মানসলোকে ভেসে ওঠে। আর সেটি হলো মনোদর্শন ও অভিজ্ঞতামূলক মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য। দর্শন বিজ্ঞান নয়, কেননা তা কোনো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে না। দর্শন একটি প্রাকসিদ্ধ বা প্রত্যয়গত অনুসন্ধান যার মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা প্রদান নয়, বরং স্পষ্টীকরণ। কাজেই, দার্শনিকের কাজ হলো স্বরূপত বস্ড়ুর সম্ভাব্য বিস্ড়ৃত বর্ণনা দেওয়া, যাতে দেখানো যায় কীভাবে আমরা তাদের বুঝব এবং কীভাবে তাদের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। বর্তমানে দুটি সঠিক প্রচলিত দার্শনিক পদ্ধতি, অবভাসবিজ্ঞান ও প্রত্যয়গত বিশে-ষণে ওইরূপ দার্শনিক লক্ষ্যকে বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্র ও অগ্রাধিকারমূলক বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, যার স্পষ্টীকরণ এখনও সম্ভব হয়নি তার ব্যাখ্যা আমরা কীভাবে দিতে পারি? নান্দনিক অভিজ্ঞতার একটি অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধান রয়েছে যা মনোবিজ্ঞানে অনুসরণ করা হয়। আর ওই অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধান অবশ্যই নন্দনতত্ত্বের আলোচ্যসূচি ও পরিধির অন্ড়র্ভুক্ত।

তিন. তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রস্ড়াবটি 'নান্দনিক বস্ড়ুর দার্শনিক অধ্যয়ন' (The philosophical study of the aesthetic object) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রস্ড়াবে যে মতের প্রতিফলন ঘটে তা হলো, নান্দনিক সমস্যার অস্ড়িত্ব আছে মুখ্যত এই কারণে যে, আমাদের জগতে বিশেষ এক শ্রেণির বস্ড়ু রয়েছে, যার প্রতি আমরা নির্বাচনমূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি এবং যাকে আমরা নান্দনিক বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করি। নান্দনিক বস্ড়ু হিসেবে যে সাধারণ শ্রেণিটাকে নির্ধারণ করা হয় তা শিল্পকর্মের অংশীভূত। আর এ কারণে তা নন্দনতত্ত্বেরও আলোচ্যসূচি ও পরিধির অন্ড়র্ভুক্ত। প্রাকৃতিক দৃশ্য, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অন্যান্য নান্দনিক বস্ড়ুকে ওই শ্রেণির মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে কেবল এই কারণে যে, তাদেরকেও শিল্পকলা হিসেবে দেখানো যেতে পারে।

যদি আমরা এই তৃতীয় প্রস্ড়াবটি গ্রহণ করি, তাহলে নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পদর্শনের মধ্যেকার পার্থক্যটি প্রকৃত পার্থক্য হিসেবে অবলুপ্ত হতে পারে, এবং নান্দনিক প্রত্যয় ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা নাম দুটি উপযুক্ত হবে যথাক্রমে, ১. শিল্পকর্মকে বোঝার জন্য যে প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়, এবং ২. শিল্পকর্মের সম্মুখীন হলে যে অভিজ্ঞতার উদ্রেক হয়– এ দু'টি ক্ষেত্রে। কাজেই, বলা যেতে পারে যে, আধুনিক নন্দনতত্ত্বে হেগেলের দার্শনিক প্রভাব অপরিসীম। কেননা তিনি মনে করেন যে, নন্দনতত্ত্বের কর্মকাণ্ড হবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলার অধ্যয়ন এবং তাদের প্রত্যেকটির অনন্য আধেয় বা বিষয়বস্ড়ুর অধ্যয়ন। বর্তমান নন্দনতত্ত্বে অধিকাংশ শৈল্পিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, এবং বলা যেতে পারে যে, সমগ্র নন্দনতত্ত্বকে শিল্পকলার অধ্যয়ন হিসেবে বিবেচনা করা কিন্ড়ু একধরনের গোঁড়ামি মনমানসিকতার পরিচয় বহন করে।

নন্দনতত্ত্বের তৃতীয় প্রস্ড়াবটির জন্য শিল্পকলার ওপর কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি যিনি মনে করেন যে, শিল্পকলা কারও নান্দনিক মূল্যের প্রকাশ ছাড়া

অতিরিক্ত কিছু নয়, তিনিও বিশ্বাস করতে পারেন যে, নন্দনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হলো নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের অধ্যয়ন, এবং তারপর, তাদের মধ্যে নান্দনিকলোকের প্রকৃত অনন্য ধর্মগুলো সন্ধান করা। যদি না আমরা নান্দনিক বস্ড়ুর প্রসঙ্গ নিয়েই সীমিত থাকি, তাহলে এই বিশ্বাস বজায় রাখা চূড়ান্ড়ভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ আকর্ষণের প্রেরণা ছাড়া এই বস্ড়ুগুলোর মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণ ধর্ম আছে। এর অর্থ হলো দ্বিতীয় প্রস্ড়াবটিকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য। নান্দনিক বস্ড়ুর প্রসঙ্গ বিশ্বের মধ্যে সীমিত থাকার জন্য ওই প্রস্ড়াবের চেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

নন্দনতত্ত্বের পরিধি বিষয়ক উপরিউক্ত তিনটি প্রস্ড়াব আমাদের অসঙ্গতিপূর্ণ পরিণামের দিকে চালিত করতে পারে, আবার তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনও করা যেতে পারে। পুনরায় উলে- খ করতে হয় যে, আমাদের দর্শনের চূড়ান্ড় লক্ষ্যবিন্দু কেবল এটাই হতে পারে যে, আমরা স্থির করতে সক্ষম হব। শুরুতেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, ওই তিনটি প্রস্ড়াব সারমর্মের দিক থেকে পরস্পর ভিন্ন হতে পারে, অথবা তাদের পার্থক্য কেবল একেকটি দিকের ওপর জোর দেওয়ার পার্থক্য। কাজেই, নন্দনতত্ত্বের প্রতিটি প্রশ্নের রয়েছে একটি ত্রিফলক কাঠামো। শুধু প্রশ্ন কেন, নন্দনতত্ত্ব নিজেই একটি ত্রিফলক বা ত্রিকোটিক শাস্ত্র। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু বাগচি-র একটি মন্ড়ব্য উদ্ধৃত হওয়ার দাবি রাখে। বাগচি বলেন :

> এসথেটিক্স তবে ত্রিকোটিক শাস্ত্র। তার তিন কোটি — এসথেটিক পে- জার, এসথেটিক ওয়ার্ক বা ওয়ার্ক অব আর্ট এবং এসথেটিক কোয়ালিটি বা বিউটি — কলারস, কলাবস্ড়ু এবং কলাগুণ বা সৌন্দর্য। এসথেটিক্স কখনও 'সায়েন্স অব এসথেটিক্ পে- জার' হয়ে আনন্দ রস চর্বণার তত্ত্বানুসন্ধান করে, কখনও 'সায়েন্স অব আর্ট' হয়ে সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্র-কাব্যাদি তাবৎ বিভিন্ন উপাদান নির্মিত কলাবস্ড়ুর স্বরূপ আলোচনা করে, আবার কখনও 'সায়েন্স অব বিউটি' হয়ে বাহ্যবস্ড়ুর সৌন্দর্যতত্ত্ব অনুসন্ধান করে।... পূর্ণাঙ্গ এসথেটিক্স সেটিই হবে, যেটিতে তার তিনকোটিকই উদঘাটিত থাকবে। তার চাইতেও আসল কথা যেটিতে তিনকোটির পরস্পর সমন্বিত নির্যাস থাকবে। কিন্ড়ু সেই এসথেটিক্স দুর্লভ (বাসটি, ১৩৮১ : ১৬৬)।

নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের স্বরূপ ও পরিধি সম্পর্কে নান্দনিকদের মধ্যেই নানাবিধ মতপার্থক্য বিদ্যমান। সম্ভবত এ কারণেই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের পরিধি বা ক্ষেত্র সম্পর্কে নান্দনিকেরা কোনো স্থির একক সিদ্ধান্ড়ে আজও উপনীত হতে পারেননি। বাস্ড়বাবস্থার দিকে তাকালে আমরা লক্ষ করি যে, চিত্রকলা, নৃত্যকলা এবং সংগীত প্রভৃতি থেকে সুন্দরের প্রকাশ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে বিজ্ঞান বা বিদ্যাকে অনেকেই প্রয়োজনের ব্যবহারিক প্রয়োগকৌশলের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে আসছেন, সেই বিদ্যাই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ফটোগ্রাফি, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে সৌন্দর্যের প্রকাশকে উত্তরোত্তর

প্রকট করে চলেছে নিরতিশয়ভাবে। দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে তাই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের পরিধি ও ক্ষেত্রকে অনির্ণীত বা অনির্ধারণযোগ্য বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। কারণ গাণিতিক বা অন্য কোনো ম্যাজিক সূত্র ব্যবহার করে আমরা নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের পরিধিকে যেমন নির্ণয় করতে পারি না, তেমনি তার পরিধি বা ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ গ িতেও সীমাবদ্ধ করা যায় না। নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনের এই ক্রমবর্ধমান বিস্ড়ৃতি এবং বৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়ে সমকালীন দার্শনিকেরা এর বিকাশধারাকে বেশ কয়েকটি স্ড়র বা পর্যায়ে বিন্যস্ড় করে দেখার পক্ষপাতী। স্ড়রগুলো হলো এরকম :

১. চিরায়ত বা ক্লাসিক্যাল নন্দনতত্ত্ব। প্রাচীন ভারতীয় নান্দনিক দ ী, বামন, ভরত থেকে শুরু করে কুড়িশতকের পূর্ব পর্যন্ড় নন্দনতত্ত্বের চিরায়ত ধারা বহমান। এই চিরায়ত ধারাকে কেন্দ্র করেই নন্দনতত্ত্ব তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে।
২. কুড়িশতকের প্রথম দশক পর্যন্ড় নন্দনতত্ত্বের চিরায়ত বা ক্ল্যাসিক্যাল ধারা বহমান ছিল। তারপর শুরু হলো নন্দনতত্ত্বের আধুনিক ধারা। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এ স্ড়রে নান্দনিক আলোচনা বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে। তাই নন্দনতত্ত্বের এই স্ড়র বৈজ্ঞানিক স্ড়র হিসেবে সমধিক পরিচিত।
৩. এর পরবর্তী স্ড়রের নন্দনতত্ত্বকে রীতির নন্দনতত্ত্ব (aesthetics of style) বলে দার্শনিকেরা অভিহিত করেছেন। কুড়িশতকের প্রথম তিন দশক রীতির নন্দনতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে। এ স্ড়রের দার্শনিকেরা একটা বিশেষ রীতি বা স্টাইল অনুসরণ করে তাঁদের নান্দনিক ভাবনা প্রকাশ করেন।
৪. চতুর্থ স্ড়রের নন্দনতত্ত্বকে বলা হয় সৃজনশীল কল্পনার নন্দনতত্ত্ব (aesthetics of creative imagination)। এ স্ড়রের নান্দনিকেরা তাঁদের মানসকল্পনাকে বাস্ড়বে রূপদান করতে এগিয়ে এলেন। কল্পনাকে কল্পলোকে না রেখে সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে এ স্ড়রে নান্দনিক ভাবনা বিকাশ লাভ করে।
৫. পঞ্চম স্ড়রের নন্দনতত্ত্বকে বলা যায় পরিবেশের নন্দনতত্ত্ব (aesthetics of the environment)। এ স্ড়রের নান্দনিকেরা কেবল কল্পলোকেই বিহার করেন না, কল্পলোকের বিমূর্ত ধারণাকেই কেবল বাস্ড়বে প্রতিফলিত করেননি। এ স্ড়রের নান্দনিকেরা, আমরা যে পরিবেশে বসবাস করছি সেই পরিবেশের ওপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।
৬. সবশেষে এলো মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের স্ড়র। শিল্পের জন্য শিল্প বা সুন্দরের জন্য সুন্দর– এই শে-াগান বদলে দিলেন মার্কসবাদী নান্দনিকেরা। মার্কসবাদী নান্দনিকেরা প্রমাণ করে দিলেন যে, সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের, নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে বাস্ড়বাদী দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। এদিক থেকে মার্কসবাদী স্ড়রের নন্দনতত্ত্বকে নান্দনিকতার জগতে এক বৈপ-বিক পরিবর্তনের সূচকবিন্দু বলে অভিহিত করা যায়।

নন্দনতত্ত্বের মূল সমস্যা

নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ইতিবৃত্ত ও ক্রমবিকাশ নিয়ে মোটামুটি বিস্ড়রিতভাবেই

আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমরা নন্দনতত্ত্বের দু'একটা সমস্যার ব্যাপারে আলোকপাত করব। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবাপন্ন যুগ পর্যন্ত নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক পঠন-পাঠন, আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস লেখকেরা নিজ নিজ মত ও সিদ্ধান্তের নিকষ-পাষাণে এসব আলোচনা সমীক্ষা করে নন্দনতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। কিন্তু এত পণ্ডিতের এত গবেষণার পরেও নন্দনতত্ত্বের দু-একটা সমস্যার সমাধান আমরা আজও করতে পারিনি।

নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার্থী মাত্রই আমরা জানি যে, সৌন্দর্যই নন্দনতত্ত্বের মূল কেন্দ্রীয় বিষয়। নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞার্থের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি একমত হতে পারলেও নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়, সৌন্দর্যের সংজ্ঞার্থ নিয়ে আজও আমরা একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। আর এটাই নন্দনতত্ত্বের মূল সমস্যা। নন্দনতত্ত্বের এ সমস্যা যে আকারেই ব্যক্ত হোক-না-কেন, শেষ পর্যন্ত তা কল্পনাবাদ ও আবেগবাদের সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়েছে। নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের সামনে আজও বড় দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। আমরা যেগুণ বা বিশেষণকে 'সুন্দর' বলছি তা-কি কল্পনার সৃষ্টি, না-কি অনুভূতি ও ভাবাবেগের প্রকাশ? এ দুই প্রশ্নের যেকোনো একটিকে আমাদের নির্বাচন করে নিতেই হবে। আর এর যেকোনো একটিকে কবুল করে নেয়ার অর্থই হলো সুন্দরের স্বরূপের ধারণায় ভিন্ন মত পোষণ করা এবং সৌন্দর্য বিচারে ভিন্ন মানদণ্ড অনুসরণ করা। সুন্দরকে যারা কল্পনার সৃষ্ট বলে মনে করেন তাঁদের কাছে কল্পনার পরামর্শ ছাড়া সৌন্দর্য বিচারের আর কোনো মানদণ্ড নেই। আর যাঁরা সৌন্দর্যকে ভাবাবেগের প্রকাশ বলে মনে করেন তাঁরা সৌন্দর্য বিচারে ভাবাবেগের মাত্রাকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সমস্যার সমাধানকল্পে কারও কারও সুপারিশ এরকম :

> এই সমস্যার সমাধান করতে দুই পথে অগ্রসর হতে পারেন। একদিকে কল্পনাকে অনুভবজাত প্রমাণ করে কল্পনার স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করতে পারেন। কল্পনাবাদ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিকে ভেঙে দিতে পারেন। অন্যদিকে, আবেগবাদের অব্যাপ্তি দেখিয়ে, কল্পনাবাদের মধ্যে আবেগবাদকে আত্মসাৎ করে নিতে পারেন। এছাড়া সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় নেই (ভট্টাচার্য, ২০০৪ : ৮১)।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো, এই সৌন্দর্য কি স্বতঃমূল্যে মূল্যবান, না-কি পরতমূল্যে মূল্যবান? কারও কারও মতে, সৌন্দর্য স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। এরা সুন্দরের জন্যই সুন্দর, শিল্পের জন্যই শিল্প– এ ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাসী। এরা মনে করেন যে, নৃত্য, গীত, শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে এবং সৌন্দর্য স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলেই নৃত্য, গীত এবং শিল্প আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে, আবার কারও কারও মতে, সৌন্দর্যের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। আত্মোপলব্ধির সক্রিয় সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু আমাদের কাছে সুন্দর হিসেবে প্রতিভাত হয় না। এঁদের মতে, কোনো কিছুকে সুন্দর হতে হলে তাকে অবশ্যই মঙ্গলময় হতে হবে। কিন্তু, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সুন্দরকে

যেমন আমরা একতরফাভাবে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলতে পারি না, তেমনি একে পরতমূল্যে মূল্যবান বলেও মনে করা যায় না।

সুন্দর স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হয়েও পরতমূল্যে মূল্যবান, আবার পরতমূল্যে সে মূল্যবান হয়েও স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। সুন্দরের স্বতঃমূল্যকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি তার পরতমূল্যকেও আমাদের স্বীকার করতে হয়। এদিক থেকে বলা যায় যে, সুন্দর কখনও হয় আত্মগত, আবার কখনও হয় বস্তুগত। কোনো বস্তুর সৌন্দর্য বের করতে হলে বস্তুটির নিজের মধ্যে যেমন সুন্দর গুণটি থাকা চাই, তেমনি সেই বস্তুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো সুন্দর মনমানসিকতাও আমাদের মধ্যে থাকা চাই। যারা সুন্দরকে কেবল বস্তুগত বলে মনে করেন, তাদের বক্তব্য যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যারা কেবল সুন্দরকে আত্মগত বলে প্রচার করেন তাদের বক্তব্যও একদেশদর্শী। বস্তুর মধ্যে সুন্দর গুণটি না-থাকলে যেমন আমরা ওই বস্তুটিকে সুন্দর বলে আখ্যাত করতে পারি না, তেমনি কোনো ব্যক্তির মধ্যে সুন্দরের ধারণা না থাকলেও সেই ব্যক্তি এই বস্তুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেন না। এ পর্যায়ে নন্দনতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

সমসাময়িক মার্কিন দার্শনিক ও নান্দনিক ডেনিশ ডাটন মানুষের নন্দনতত্ত্বের সাতটি লক্ষণধর্ম চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকে নন্দনতত্ত্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যাত করা যায়। যদিও এগুলোর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ব্যতিক্রম বিদ্যমান এবং কোনো কোনোটির ব্যাপারে কিছু আপত্তিও উঠতে পারে, তবু নান্দনিক আলোচনার প্রারম্ভিক স্তরে এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। নন্দনতত্ত্বের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যারা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে প্রথম পাঠ শুরু করবেন, এগুলো স্মরণ রাখলে নন্দনতত্ত্বের পাঠ গ্রহণে তারা উপকৃতই হবেন। আর এ কারণেই বর্তমান প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করা হলো।

১. দক্ষতা এবং জ্ঞান (expertise and virtuosity) : ডেনিশ ডাটন-এর মতে, নান্দনিক আলোচনা বা শিল্পকলার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, নান্দনিকতায় বিশেষ দক্ষতা এবং ধারাবাহিক জ্ঞানের উপস্থিতি। সাধারণত শিল্পবস্তুর উৎপাদন এবং শৈল্পিক আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ দক্ষতা ও ধারাবাহিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এর অভাবে শিল্পবস্তুর উৎপাদন এবং শৈল্পিক আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। কোনো কোনো সমাজে এই দক্ষতা ও জ্ঞান একটি শিক্ষানবিশ ঐতিহ্য থেকে অর্জিত হয়ে থাকে। অথবা এটি স্বাভাবিকভাবেই এমন একজনের দ্বারা অর্জিত হতে পারে, যিনি মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর একটি প্রতিভা রয়েছে। যেখানে এই বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞান নিজের সংস্কৃতির মধ্যে কার্যত প্রত্যেকের দ্বারাই অর্জিত হয় যেমন : কোনো সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং নৃত্য ইত্যাদি, সেখানেও এমন ব্যক্তি

হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, যিনি তাঁর বিশেষ প্রতিভার দ্বারা স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। প্রকৌশলীর নান্দনিক দক্ষতা ও জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী লক্ষ করা যায়, এবং সাধারণত তাঁরা প্রশংসিত হন।[৯]

২. অনুপযোগবাদী সুখ (non-utilitarian pleasure) : নন্দনতত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, অনুপযোগবাদী সুখ সন্ধানের প্রচেষ্টা। ডাটন-এর মতে, শিল্পের জন্যই মানুষ শিল্পকর্ম উপভোগ করে। অন্য কোনো ব্যবহারিক বা ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা নান্দনিক আলোচনায় একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাই শিল্পকর্মকে বৈষয়িক বা ব্যবহারিক স্বার্থসিদ্ধির উপায় বা জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে বিবেচনা করতে হয় স্বরূপত সুখের উৎস হিসেবে, তাতে তা কল্পিত কাহিনি হোক অথবা হস্ড়শিল্প সামগ্রী অথবা হোক অন্য কোনো শৈল্পিক আয়োজন। শিল্পকর্ম বা নান্দনিকতার রূপায়ণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী হতে পারে, যেমন : ছুরি, ঢাল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি, অথবা তথ্য জ্ঞাপনের উপায়। কিন্ড়ু এই ব্যবহারোযোগিতাই যেন মুখ্য হয়ে না দাঁড়ায়। মূর্ত রূপায়ণের দিকটি এইরূপ ব্যবহারিক উপযোগিতার পাশাপাশি কিন্ড়ু আপাতসুখের অনুভবই প্রদান করে। নান্দনিক আলোচনায় এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১০]

৩. শৈলী (style) : শৈলী নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শিল্পকলা বা নান্দনিকতার কিছু সৃজনরীতি রয়েছে। এগুলোকে নান্দনিক রচনার সাংগঠনিক বিধিমালা বলেও নান্দনিকেরা অভিহিত করে থাকেন। উলে-খ্য, এই সৃজনরীতি বা সাংগঠনিক বিধিমালাই কোনো শিল্পকর্ম বা নান্দনিক আলোচনাকে স্বীকৃত শৈলীর মর্যাদা দান করে। নান্দনিকেরা মনে করেন যে, শিল্পবস্ড়ু সম্পাদনার রীতিনীতি অনুসারে শিল্পকলা সহজগ্রাহ্য শৈলীতেই রচিত ও উপস্থাপিত হওয়া উচিত। শৈলীগত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়; তা যেমন দেখা যায় প্রাক-আধুনিক শিল্প শৈলীতে, তেমনি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নান্দনিক ভাবনায়ও। কিছু শিল্পবস্ড়ু বা সম্পাদনা, বিশেষত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, কঠোরভাবে ঐতিহ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্ড়ু অন্যান্য ক্ষেত্রে তা উন্মুক্ত, স্বাধীন, সৃজনশীল এবং ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাই, নন্দনতত্ত্বে শৈলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ শৈল্পিক রীতির অভাবে একটি ভালো শিল্পকর্ম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।[১১]

৪. সমালোচনা (criticism) : সমালোচনা নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিক আলোচনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নান্দনিক কর্মের বিচার করা, মূল্যায়ন করা, উপলব্ধি করা এবং ব্যাখ্যা করার নামই সমালোচনা। তবে এই আলোচনা হতে হবে নিরপেক্ষ এবং মোহমুক্ত। কোনো ধরনের প্রাক-প্রতিষ্ঠিত ধারণা নিয়ে সমালোচনা করা নান্দনিক ঐতিহ্যের পরিপন্থি। ডাটন-এর মতো, উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করার জন্য সহজ বা বিস্ড়ৃত স্বদেশীয় সমালোচনার ভাষা রয়েছে যা শিল্পকলা বা নান্দনিক আলোচনায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এটি যেমন হতে পারে বিপণনের ভাষা, তেমনি হতে পারে, শ্রোতা-দর্শক বা সমালোচকের মূল্যায়নমূলক তর্ক-বিতর্ক। স্বরূপত শিল্পকলা ছাড়া যা অনেক বেশি

জটিলতর হতে পারে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, মৌখিক সংস্কৃতিতে সমালোচনামূলক তর্ক-বিতর্ক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সমালোচনা সাহিত্য অনেক বেশি অনুন্নত; তবে, এখানেও তার বিস্ড়ার লাভ করতে পারে।[১২]

৫. অনুলিপি (imitation) : গ্রিক ভাষায় অনুলিপিকে বলা হয় 'মাইমেসিস'। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিল্পকলা, যেমন : সংগীত ও বিমূর্ত চিত্রকলা ছাড়া অন্যান্য শিল্পকলা হলো জাগতিক অভিজ্ঞতার অনুলিপি, প্রতিলিপি বা নকল। গ্রিক দাশনিক পে-টো শিল্পকলাকে অনুকরণের অনুকরণ বলে নিন্দে করছেন।[১৩] ডাটন মনে করেন যে, প্রাকৃতবাদের ব্যাপক বৈচিত্র্যময় পর্যায়ে ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও মৌখিক উপাখ্যান ইত্যাদি সহ শিল্পকলা মাত্রই আমাদের

বাস্ড়ব ও কল্পিত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা অনুলিপি উপস্থাপন করে। প্রাকৃতবাদী উপস্থাপন বা উঁচু শৈলীর প্রতিরূপায়ণের সঙ্গে অ-প্রতিরূপক প্রতীকবাদের পার্থক্যকে সাধারণত শিল্পী ও তার শ্রোতা-দর্শকেরা সহজেই অনুধাবন করেন। সংবাদপত্রের গল্পচিত্র, পাসপোর্টের ছবি, রাস্ড়ার মানচিত্র, বিভিন্ন প্রকার ছক বা নকশাও সমানভাবে কোনো কিছুর প্রতিকৃতি বা অনুলিপি। যদিও বিমূর্ত চিত্র ও সঙ্গীতের মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুলিপি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্ড়ু এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অনুলিপির তাৎপর্য মানুষের সমস্ড় বৌদ্ধিক জীবনে প্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. বিশেষ দৃষ্টিপাত (special focus) : বিশেষ দৃষ্টিপাত নান্দনিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নান্দনিক ভাবনা এবং শিল্পকলা সৃষ্টিতে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হয়। এলোমেলো মন নিয়ে নান্দনিক ভাবনা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। ডাটন-এর মতে, শিল্পকর্ম ও শৈল্পিক আয়োজন দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রায়শই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, এবং আমাদের অভিজ্ঞতাকে একটি বিশেষ দিকে কেন্দ্রীভূত করে। যদিও অসংখ্য গতানুগতিক তুচ্ছ শিল্পকর্ম বা কারুকর্ম রয়েছে, যেমন : তাঁতের কারুকার্য, মাছ ধরা বা জাল বুনানোর সময় লোক-গীতি গাওয়া, কিংবা স্নানঘরে স্নানের সময় গুনগুনিয়ে জনপ্রিয় গান গাওয়া ইত্যাদি। কিন্ড়ু প্রত্যেকটি সুপরিচিত সংস্কৃতির বিশেষ ধরনের শিল্পকর্ম বা কারুকর্ম থাকে, যাকে নান্দনিকেরা 'অনন্য সৃষ্টি' বলেছেন। এসব শৈল্পিক ও নান্দনিক কর্মকা- প্রায়শই তীব্র ভাবাবেগ ও সম্প্রদায়বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাতে বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক ও নান্দনিক কৌশলের সমন্বয় ঘটে, যেমন : ভজন-কীর্তন, নৃত্য, পোশাক পরিচ্ছদ এবং নিউগুনিয়ার গান গাওয়ার ক্ষেত্রে নাটকীয় আলোকসজ্জা ইত্যাদি। আর এভাবেই নান্দনিক ভাবনা ও আলোচনা এবং শৈল্পিক কর্মকা- আমাদের অজান্ড়েই বিশেষ দৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে।[১৪]

৭. কল্পনা (imagination) : সৃজনশীল যে কোনো কর্মেই কল্পনাশক্তির ভূমিকা অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। এই কল্পনাশক্তির ওপর ভর করেই নান্দনিক বা শৈল্পিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। তাই শিল্পীমাত্র কল্পনাপ্রবণ। শিল্পী এবং শ্রোতা-দর্শকেরা যেন কল্পনার নাট্যশালার একটি কাল্পনিক বিশ্ব উপভোগ করেন। ডাটন মনে করেন যে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা হলো,

তার স্রষ্টা ও উপলব্ধিকারী উভয়ের কাছেই একটি কল্পিত অভিজ্ঞতা। একটি খোদাই করা মূর্তি একটি প্রাণীকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিরূপায়ণ করতে পারে। কিন্তু তা একটি ভাস্কর্য হিসেবে কল্পনার বিষয় বা বস্তু হয়ে ওঠে। এই একই কথা একটি সুগঠিত গল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে, তাতে তা প্রাচীন পৌরাণিক গল্প হোক, অথবা বাস্তব ব্যক্তিবিষয়ক কোনো গল্পগুজবই হোক।[১৫]

আধুনিক প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্বের জনকরূপে সর্বাধিক পরিচিত আলেকজান্ডার গোটলিব বৌমগার্টেন ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Aesthetica* শীর্ষক কালজয়ী গ্রন্থের আলোচনায় নন্দনতত্ত্বের কয়েকটি গতিপ্রকৃতির বিভিন্নতা ও সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে নান্দনিক আলোচনার আরও সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উলে-খ করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানার্জনের শাখা হিসেবে নন্দনতত্ত্ব একটি অনন্য শাস্ত্র। আর নন্দনতত্ত্বের এই অনন্যতা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তার কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ওপর। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিক আলোচনাকে জনপ্রিয়তার চরম শিখরে উন্নীত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো এরকম :

১. পারস্পরিক সঙ্গতি (Harmony) : চিন্তা ও বক্তব্যের পারস্পরিক সঙ্গতি, বৌমগার্টেনের মতে, নান্দনিক আলোচনা বা নন্দনতত্ত্বের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সঙ্গতিবিহীন চিন্তা ও বক্তব্য নান্দনিক হয় না। নন্দনতত্ত্ব আমাদের আসক্তিবিহীন জ্ঞানের যোগান দেয়। আর এই জ্ঞানের সৌন্দর্য বা নান্দনিকতা বহুলাংশে চিন্তার পারস্পরিক সঙ্গতির ওপর নির্ভরশীল। যখন শিল্পকর্মের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তখনই সেটিকে বলে সঙ্গতি। অনেকগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র রূপের সমষ্টি আমাদের মনে অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করে। চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতির ব্যত্যয় ঘটলে এই অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ তৈরি হতে পারে না। তাই পারস্পরিক সঙ্গতি নান্দনিকতার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

২. সততা (Honesty) : যে কোনো মানবীয় চিন্তা বা কর্মে সততার ভূমিকা অগ্রগণ্য। সততার কোনো বিকল্প নেই। একারণেই বলা হয়ে থাকে যে, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি (honesty is the best policy)। আলেকজান্ডার বৌমগার্টেনও সততাকে নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিক আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন। নান্দনিক আলোচনায় সততা ও নান্দনিকতা অবিভাজ্য, একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করাযায় না। সম্ভবত এ কারণেই জন কিটস বলেছিলেন : 'Beauty is truth, truth beauty'—That is all. (Garrod, 1973 : 215)।

৩. প্রতিসাম্য (Symmetry) : বৌমগার্টেনের ব্যাখ্যা অনুসারে নান্দনিক আলোচনার বা নন্দনতত্ত্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পারস্পরিক সঙ্গতিতে উলে-খ করা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যে ক্ষুদ্র রূপের সমষ্টি আমাদের মানসলোকে অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রূপগুলো বিভিন্ন অংশের স্রেফ সমষ্টিমাত্র নয়। এগুলো

আসলে একেকটি নতুন এবং ভিন্ন গুণসম্পন্ন সৌন্দর্যবোধ। এই ক্ষুদ্র রূপগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই, অখণ্ড ও সর্বাত্মক সৌন্দর্যবোধের স্বার্থে অংশগুলোর মধ্যে প্রতিসাম্য থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য।

৪. অখণ্ডতা (Compactness) : বৌমগার্টেনের মতে, নান্দনিক রচনায় অকারণে কলেবর বৃদ্ধি করা চলবে না। শুধু নান্দনিক আলোচনা কেন, যে কোনো ব্যাপারেই অকারণে বেশি কথা বলা যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি শোভনও নয়। নন্দনতত্ত্ব একটি প্রণালিবদ্ধ বিজ্ঞান। তাই নন্দনতত্ত্বের সৌন্দর্যের খাতিরে অতিরিক্ত বলা বা লিখন থেকে আমাদের বিরত থাকা প্রয়োজন। অকারণে কলেবর বৃদ্ধি ঘটালে সৌন্দর্য ও সুষমা হানি ঘটার আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, অতিরঞ্জন, বাগাড়ম্বর ইত্যাদির নান্দনিক মূল্য থাকলেও নান্দনিক আলোচনায় এদের ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

৫. বিধি-বিধান ও প্রবণতা (Order and Disposition) : যে কোনো সহজ কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আর এই পরিকল্পনাকে অবশ্যই প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী তৈরি করতে হয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে আবার মানসিক প্রবণতাও সজীব থাকা চাই। নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো হলো প্রধানত দুটি। যথা : চিন্তা এবং বিষয়। এই চিন্তা এবং বিষয়ের মধ্যে একটি সংযুক্তি অপরিহার্য। তা না হলে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে পারেন না। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এবং মানসিক প্রবণতাকে সজীব রেখে শিল্পী শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করলে তবেই তা হবে নান্দনিক।

৬. অভিব্যক্তির উপায় (Means of Expression) : অভিব্যক্তির উপায়কেও নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রূপে বিবেচনা করেছেন বৌমগার্টেন। শিল্প বা নান্দনিকতার সার্থকতা অভিব্যক্তি বা প্রকাশে। শিল্পী যদি তাঁর শিল্পকর্মকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করতে না পারেন তাহলে শিল্পী নিজে যেমন, তেমনি দর্শক, পাঠক বা শ্রোতাও সৌন্দর্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত হন। কাজেই শিল্পী তাঁর শিল্পকে কীভাবে বাইরে প্রকাশ করবেন তার উপায় তাকেই আবিষ্কার করতে হবে।

৭. সত্যতা ও স্বচ্ছতা (Truth and Lucidity) : বৌমগার্টেনের মতে, সত্যতা আর স্বচ্ছতা নান্দনিক আলোচনা বা নন্দনতত্ত্বের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য। সত্যতা হচ্ছে জীবনের চিরন্তন ধর্ম। আর স্বচ্ছতা যে কোনো আলোচনা বা বক্তব্যের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। নান্দনিক জ্ঞান যেমন সত্যতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে চলবে না, তেমনি অস্বচ্ছ হলেও তা জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারবে না। নান্দনিক জ্ঞান তখনই সার্থক হয়, যখন সেই জ্ঞানে সত্যতা ও স্বচ্ছতার এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।

নন্দনতত্ত্বের কাজ

ঐতিহ্যগতভাবে নন্দনতত্ত্ব দর্শনেরই একটি অঙ্গারাজ্য। দর্শনের শাখা হিসেবে নন্দনতত্ত্বের বিশেষত্ব কী, নন্দনতত্ত্বের মূল্য ও কার্যাবলি কী, সর্বোপরি এর সামাজিক প্রতিপাদ্য কী? এসব প্রশ্ন হরহামেশাই ওঠে। আমরা যদি নন্দনতত্ত্বের কর্ম-প্রক্রিয়া এবং মূল্যকে দর্শনের অন্যান্য শাখা, যেমন : দর্শনের ইতিহাস, অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞানদর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মদর্শন এবং নীতিবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করতে অগ্রসর হই তাহলে নন্দনতত্ত্বের মূল্য ও কর্ম-প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি মানুষের সমাজজীবনে এর ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে একটা ধারণা লাভ করতে পারি। তুলনামূলক আলোচনায় আমরা লক্ষ করতে পারব যে, দর্শনের উলি-খিত শাখা এবং নন্দনতত্ত্বের মধ্যে সাধারণভাবে যা রয়েছে, নন্দনতত্ত্ব ওই সকল শাখা থেকে যা নেয় ও তাদের যা দেয় এবং কোথায় নিহিত রয়েছে নন্দনতত্ত্বের বিশেষত্ব, এসব বিষয়ে অনুসন্ধান থেকেই একটি ফলপ্রসূ জবাব পাওয়া যাবে।

দর্শনের ইতিহাসে যিনি নন্দনতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন তিনি একে তাঁর অন্য কিছুর চিন্ড্রা দিয়ে গ্রহণ করেছেন। যখন তাঁর নান্দনিক প্রতিক্রিয়া অন্য কোনো ধারণাকে অথবা তাঁর যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাকে উদ্ভাসিত করেছে, তখন তিনি নন্দনতত্ত্বকে বিবেচনা করেছেন। গ্রিক দার্শনিক পে-টোর ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। তিনি নন্দনতত্ত্বের বিষয়কে নির্বাচন করেননি এবং বিষয়টিকে তিনি অন্য কিছু থেকে পৃথকও করেননি। যখন তিনি নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন মনে হয় তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না যে, তিনি এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করছেন, যা রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা বা অধিবিদ্যা থেকে স্বরূপত ভিন্ন। তাঁর কাছে নন্দনতত্ত্ব ছিল একটি সমগ্র হিসেবে চিন্ড্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেন তিনি শিল্পকলাকে একটি অনুলিপির অনুলিপি হিসেবে বিবেচনা করেছেন তা বুঝতে হলে দেখতে হবে কত ঐকান্ড়িকতার সঙ্গে তিনি তাঁর ধারণাতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন, এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিম-ল সৃষ্টিতে শিল্পীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কতটা বিদ্রোহী ছিলেন।[১৬]

গ্রিকদের নন্দনতত্ত্ব চরম উৎকর্ষ সাধন করে পে-াটিনাস-এর এক বা 'One'-এর ধারণার মধ্যে। কারণ গ্রিকরা সার্বিক ধারণার দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। সম্ভবত তাঁরা ব্যক্তিবিশিষ্টবাদী (individualistic) বা আত্ম-প্রকাশক ছিলেন। কিন্ড়ু, তাঁরা শিল্পকে আত্ম-অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা না করে ব্যক্তিবিশিষ্ট জগতের অতিবর্তী কোনো বাস্ড়বতার অনুকৃতি হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে, নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিকদের সংস্কৃতি ছিল সাদাসিধে ও জটিলতাবিহীন। কান্ট ও তাঁর অনুগামীদের নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ববীক্ষা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। কালপ্রবাহের লক্ষণীয় পরিবর্তনেও গ্রিকদের পরিকল্পিত জগৎকাঠামোর পরিবর্তন খুব ধীরগতিতে হয়েছে, যতক্ষণ তা কান্টের দ্বারা একটি মনের নির্মাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি একটি মানবিক কাঠামো, ঐশ্বরিক কোনো আকার নয়।

গ্রিকেরা অদৃষ্ট বা ভাগ্যে বিশ্বাস করতেন, যার কিছু সীমা ছিল এমন সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে

যারা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। কিন্ড়ু অসীম আত্মউন্নয়ন ও অভিন্ন ব্যক্তির জন্য কান্টের ছিল রোমান্টিক আকুল আকাঙ্ক্ষা। তিনি স্বাধীনতার প্রয়োজন বোধ করতেন, যা বিস্ফোরিত হয় ফরাসি বিপ-বের সময়। কান্ট নান্দনিক মনোভাবের নির্গমন পথ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানের জালে আটকে পড়ার পর, যা থেকে একমাত্র আপাত মুক্তির অর্থ ছিল শর্তনিরপেক্ষ আদেশের আনুগত্য কবুল করে নেয়া। জর্জ এইচ. মিড (Mead, 1969 : 149) তাই বলেন যে, কান্ট তাঁর *Critique of Judgement* গ্রন্থে একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন, যেখানে বস্ড়ুগুলো এমন একটি বিন্যাসরীতিতে সজ্জিত হয়, যাতে তা আমরা উপভোগ করতে পারি। একটি শাশ্বত সত্তা প্রতিফলিত না হওয়ার জন্য পে-টো কর্তৃক নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার নিন্দা থেকে তা অনেক দূরের ব্যাপার। এমনকি, বস্ড়ুনিষ্ঠ পরিপূর্ণতার ঝলক হিসেবে তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা থেকেও অনেক দূরের ব্যাপার।

১. কাজেই, নন্দনতত্ত্বের অন্যতম একটি কাজ হলো আদর্শরূপ সার্বিকের প্রতি প্রাচীন আগ্রহ থেকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আধুনিক আগ্রহের উত্তরণকে নির্ধারণ করা। এটি এমন একটি উত্তরণ, যাকে দর্শনের ইতিহাসে অধিবিদ্যা থেকে বিজ্ঞানের দর্শনে উত্তরণ হওয়ার সমান্ড়রাল বলা যায়। সৌন্দর্য সম্বন্ধে পে-টোর ধারণা ও হোয়াইটহেডের ধারণার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে এই উত্তরণকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। হোয়াইটহেড চেয়েছিলেন পে-টোর কালহীন উপাদানকে অব্যাহত রাখতে। কিন্ড়ু যা কালিক তার বাস্ড়বতাকে তিনি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'অনুভব'-এর ওপর আদ্যতা প্রদান করেন। হোয়াইটহেডের এই 'অনুভব' এবং কান্টের 'নান্দনিক অবধারণ' প্রায় অভিন্ন। এর সমর্থন পাওয়া যায় কান্টের তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মিড-এর বক্তব্য থেকে। মিড বলেন : 'কান্ট একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন, যেখানে বস্ড়ুগুলো এমন এক বিন্যাসরীতিতে ঐক্যবদ্ধ যাতে তা আমরা উপভোগ করতে পারি' (Mead, 1969 : 152)। এভাবে, হেয়োইটহেড নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে অধিবিদ্যা থেকে বিজ্ঞানদর্শনের উত্তরণটিকে দেখিয়েছেন। কারণ, তাঁর অনুভবের মুখ্য প্রত্যয়টি মূলত অধিবিদ্যক, যদিও তা আধুনিক বিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

২. নন্দনতত্ত্বের আরেকটি কাজ হলো, শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে থাকা স্বভাবগত সাযুজ্যকে তুলে ধরা। উপাত্ত সংগ্রহের পর্যায়ে, যখন একজন বিজ্ঞানী তাঁর প্রকল্পের জন্য কোনো সংকেত সূত্র খোঁজেন, তখন তাঁর আচরণ যেন একজন শিল্পীর মতো যিনি কোনো অনুপ্রেরণার অপেক্ষায় রয়েছেন। যখন শিল্পী তাঁর অনুপ্রেরণা খুঁজে পান, তখন সেই প্রেরণার প্রতিপাদ্যকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন ঠিক একজন বিজ্ঞানীর মতো, যিনি তাঁর প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন 'যদি ক, তাহলে খ'-এধরনের প্রাকল্পিক প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে। শিল্পী ও

বৈজ্ঞানিকেরা যে কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাই নয়, বিজ্ঞানকে নান্দনিকরূপেও অনেক সময় তাঁরা বিবেচনা করে থাকেন। তখন বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে শিল্পকলা। বিজ্ঞানের সঙ্গো অধিবিদ্যা ও ধর্মের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে বিস্ড়ৃত নাটকের প্রতি আগ্রহ রয়েছে তা খুব সহজেই দেখানো যায়। বিশেষভাবে তা দেখানো যায় বিজ্ঞানের অভ্যন্ড়রীণ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শিল্পকলাকে অলঙ্কৃত করেছে নতুন বিষয়, নতুন উপাদান, নতুন যন্ত্রপাতি এবং নতুন সংবেদনশীলতা দিয়ে। নন্দনতত্ত্ব এ বিষয়গুলোই তুলে ধরে।

৩. পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের অবদান মূল্যায়ন করাও নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত। নান্দনিক অভিজ্ঞতার উপাদানগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে তোলার ব্যাপারে পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের যে অবদান রয়েছে, নন্দনতত্ত্ব অবশ্যই তার বিচার করে। যদিও পরীক্ষামূলক ফলাফলের মূল্য সম্বন্ধে অনেক নান্দনিক সংশয় প্রকাশ করেন, কিন্ড়ু একজন গবেষকের ধর্ম হলো বৃহৎ প্রকল্পের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ড় সংশয় অব্যাহত রাখা, যতক্ষণ তিনি প্রবল প্রতিরোধের সামনেও নিজের অনুসন্ধিৎসার কাজে টিকিয়ে রাখতে পারছেন। যেহেতু আধুনিক নন্দনতত্ত্বে সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মধ্যেই নন্দনতত্ত্বের পরিধি সীমিত, সেকারণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যেকোনো তথ্যই নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে, তাতে সেই তথ্য আচরণের নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের দ্বারা অর্জিত হোক, অথবা মনোবিজ্ঞানীর অন্ড়র্দর্শন দ্বারা, অথবা অন্য ব্যক্তির অন্ড়র্দর্শনের প্রতিবেদন অধ্যয়নের দ্বারা। সবচেয়ে ভালো কথা হলো, মানবপ্রকৃতির প্রতিটি দিকের দ্বারা, সম্ভাব্য প্রতিটি উপায়ের দ্বারা নান্দনিক অভিজ্ঞতার উৎস ও ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। তাই পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের অবদানকে নান্দনিকেরা উপেক্ষা করেন না। তাঁরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের অবদান বিচার করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করে থাকেন।

৪. বিষয়বস্ড়ুর ওপর নতুনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা নন্দনতত্ত্বের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নন্দনতত্ত্বের এ কাজ উনিশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ড় প্রবহমান। নন্দনতত্ত্বের এ ধরনের ভূমিকার ফলেই জ্ঞানরাজ্যে 'শিল্পকলা বিজ্ঞানের' উদ্ভব। চিরাচরিত নন্দনতত্ত্ব ব্যাপকভাবে সৌন্দর্য এবং ব্যক্তির ওপর শিল্পকলার প্রভাবের সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। পক্ষান্ড়রে, শিল্পকলাবিজ্ঞানের বেশিরভাগ জুড়ে রয়েছে শিল্পী ও শিল্পকলার স্বরূপ। নন্দনতত্ত্ব শিল্পী ও শিল্পকলাকে উপেক্ষা করে না। তবে দর্শক বা শ্রোতার মনোভাবের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে শিল্পী ও শিল্পকলা কিছুটা দূরে সরে এসেছে। পক্ষান্ড়রে, শিল্পী সংক্রান্ড় ও তাঁর সাজসজ্জা, কর্মকান্ড, কৌশল সংক্রান্ড় অধ্যয়ন শিল্পকলা বিজ্ঞানের অভিমুখে ধাবিত করে, যেখানে গতানুগতিক নন্দনতত্ত্ব যতটা প্রয়োজনীয়

বলে মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ড়ৃত বিশে- ষণ শিল্পকলা-বিজ্ঞানে লক্ষ করা যায়। শিল্পকলা-বিজ্ঞান বিষয়ী বা ব্যক্তিকেও উপেক্ষা করে না। যেমন : দেসোয়ার মনে করেন, নান্দনিক বিষয় ও বিষয়ীকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত হবে না। এমনকি উপলব্ধিকারীর মনোভাব যখন স্পষ্টভাবে অধিগত, তখনও এই মনোভাবকে বস্ড়ুর কাঠামোর মধ্যে পৃথকযোগ্য সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতরূপে দেখা উচিত।

৫. যৌক্তিক পদ্ধতি জানা এবং তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা নন্দনতত্ত্বের আরও একটি উলে- খযোগ্য কাজ বলে নান্দনিকেরা মনে করেন। নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় দর্শন মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও এমনকি নন্দনতত্ত্ব যখন শিল্পকলা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তখনও তা দর্শনের শাখাই থাকে। নন্দনতত্ত্বের সঙ্গো যেমন দর্শনের অন্যান্য শাখার সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনি তা যুক্তিবিদ্যার সঙ্গোও সম্পৃক্ত। ব্যক্তির বিশেষ তাৎপর্যের দিকে গুরুত্ব আরোপণের ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব একটি যৌক্তিক সমস্যায় নিপতিত হয়। সমস্যাটি হলো, কীভাবে ওই তাৎপর্যকে সেই অর্থের সঙ্গো যুক্ত করা যাবে যাকে সাধারণভাবে অনুধাবন করা যায়? এর সমাধানে নান্দনিকেরা যুক্তিবিদদের বলতে পারেন যে, বিজ্ঞানীরা তাকেই মনোনীত করেন যাকে তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। তাকে তাঁরা এমনভাবে প্রকাশ করেন যাতে তার অনন্য তাৎপর্যটিকে ধ্বংস না করে তাতে সাধারণ অর্থটি প্রদান করা যায়। এখানে শিল্পীরা যা করেন তার একটি অনুধাবনযোগ্য বিবৃতি নান্দনিকেরা দিতে চাইলে নান্দনিক অভিজ্ঞতা, শিল্পকর্ম এবং তার পরিভাষার সংজ্ঞার্থ দেওয়ার জন্য নান্দনিককে অবশ্যই যৌক্তিক পদ্ধতি জানতে হয় এবং তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। নন্দনতত্ত্ব একাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করে।

৬. শিল্পকলার অংশীভূত উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা নন্দনতত্ত্বের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। একটি শিল্পকলায় নানা ধরনের বহু বিচিত্র উপাদান থাকে। এগুলোর পরস্পরিক আন্ড়ঃসম্পর্ক নির্ণয় করা একান্ড়ভাবে অপরিহার্য। নন্দনতত্ত্ব এ কাজ খুব গুরুত্বের সঙ্গোই সম্পাদন করে। কোনো শিল্পকলার অংশীভূত উপাদানগুলোর পরস্পরিক সম্বন্ধকে যে ক্ষেত্রে অভ্যন্ড়রীণ বলে মনে হয়, যেক্ষেত্রে সম্বন্ধযুক্ত উপাদানগুলোর মধ্যে পুনরাবৃত্তি থাকে, যা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আকারগত। এ যেন শাশ্বত সত্তার অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত হওয়ার মতো একটি প্রক্রিয়া। প্রাউস্টের সাহিত্যকলার ভিত্তি ছিল আকারণগত পুনরাবৃত্তি যাকে তিনি পে- টোনিক সারধর্ম বলে উলে- খ করেছেন। একই কথা টমাস মান-এর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (Mead, 1969 : 173)। এই সচ্ছল আধুনিক শিল্পীরা যখন ব্যক্তিগত অন্ড়র্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁরা পুলকিত হয়ে যান বিশেষগুলোর আদর্শে পতিত

হওয়া দেখে; যা তাঁদের নিয়ে যায় কাজটিকে অনুসরণ করার দায়বদ্ধতার দিকে। এ যেন এক নান্দনিক আদেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে দেখার আদেশ, যা কান্টের নীতিতত্ত্বের শর্তনিরপেক্ষ আদেশের চেয়ে কোনো অংশে কম শর্তনিরপেক্ষ নয়। এভাবেই নন্দনতত্ত্ব শিল্পকলার বৈচিত্র্যময় উপাদানের পারস্পরিক আন্ড়ঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

৭. নান্দনিক অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করাও নন্দনতত্ত্বের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। কান্ট, শিলার, শোপেনহাওয়ার প্রমুখ নান্দনিকেরা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্ড়ু ডিউঈ ও বুরমেয়ার প্রমুখ দার্শনিক যে কোনো অভিজ্ঞতাকেই নান্দনিক অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করেন। ডিউঈ মনে করেন যে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার এক সঙ্গতিপূর্ণ অংশ। ডিউঈ-র বিরোধী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনসামগ্রী থেকে, চিন্ড়াভাবনার ছাপ অথবা ভাবাবেগের গুরুভার থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার ফল হিসেবে মানুষের মধ্যে নান্দনিক অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে। কিন্ড়ু ডিউঈ মনে করেন যে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা আমাদের মুক্তি ও সন্ড়ুষ্টি এনে দেয়। কারণ নান্দনিক অভিজ্ঞতা এমন কিছুর প্রাপ্তি, যাকে আমরা ধারাবাহিকভাবে খুঁজি। নান্দনিক অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও তাৎপর্য নিয়ে এই যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, নন্দনতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশে-ষণ করে উভয় মতের মধ্যে একটা রফা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, নান্দনিক অবধারণ মূলত ও মুখ্যত অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার বিষয়, এবং শৈল্পিক প্রগতি কোন দিকে পরিচালিত হবে তার একটি আদর্শ রয়েছে। আর এই আদর্শই নান্দনিক অবধারণের পরস্পরিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে (Matin, 2006 : 267-268)। এখানে উলে-খ্য যে, নন্দনতত্ত্ব কেবল নান্দনিক অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা করে না, সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব নান্দনিক প্রত্যয়, নান্দনিক প্রতিক্রিয়া, নান্দনিক ধর্ম, নান্দনিক নীতি, নান্দনিক গুণ, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিক স্বভাব, নান্দনিক মন, নান্দনিক অভিরুচি, নান্দনিক মূল্য, নান্দনিক মনোভাব, নান্দনিক ক্ষেত্র, নান্দনিক ভাবাবেগ, নান্দনিক প্রত্যক্ষণ এবং নান্দনিক আদর্শ নিয়েও আলোচনা করে। নান্দনিক অভিজ্ঞতার মতো এসবের স্বরূপ ও নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করাও নন্দনতত্ত্বের কাজ।

সাধারণ মন্ড়ব্য

সব কিছু বলতে না পারলেও আমরা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার প্রায় শেষ প্রান্ড়ে এসে পৌঁছে গেছি। বর্তমান প্রবন্ধে নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শনের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় নিয়ে বিস্ড়রিতভাবে আলোচনা করা হলো। নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পদর্শন যে অন্ড়ত পরিধি ও আলোচ্যসূচির দিক থেকে পৃথক, একথা আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই

পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করেছি। প্রাথমিক পরিচয় শিরোনামে উপস্থাপিত অনুচ্ছেদে নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞার্থ রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। নান্দনিক অবধারণের স্বরূপ ও নিহিতার্থের আলোচনা নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ নিয়েও যথাস্থানে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পকলার স্বরূপ ও তাৎপর্যও নান্দনিক আলোচনার অন্ড়র্ভূত। এ নিয়েও প্রবন্ধের যথাস্থানে বিস্ড়তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পকলার বিভিন্ন উপাদানের ওপরও বর্তমান প্রবন্ধে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা শিল্পকলার বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এই তত্ত্বগুলোর মূল্যায়নও যথাস্থানে করা হয়েছে।

মানুষ মাত্রই সমাজবদ্ধ জীব। আর প্রত্যেকটি মানবিক সমাজই কোনো-না-কোনো সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। শিল্পকলা কীভাবে মানব সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এ বিষয়েও পৃথক একটি অনুচ্ছেদে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এরপর নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিক আলোচনার ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক পে-টো, এরিস্টটল, পে-াটিনাস থেকে শুরু করে আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিক ও নান্দনিক চিন্ড়ার প্রতিফলন আমরা এ অনুচ্ছেদে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি। এরপর আমরা পৃথক একটি অনুচ্ছেদে নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও বিষয়বস্ড়ু নিয়ে আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও আলোচ্য বিষয় এখনও পর্যন্ড় অনির্ণীত (ভট্টাচার্য, ২০০৪ : ৪২)। এ কথা মাথায় রেখেই আমরা নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং পরিধির একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছি বর্তমান প্রবন্ধে। এরপর নন্দনতত্ত্বের দু একটা প্রচলিত সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে পৃথক একটি অনুচ্ছেদে। প্রখ্যাত নান্দনিক ডেনিশ ডাটন এবং আলেকজান্ডার গোটলিব বৌমগার্টেনকে অনুসরণ করে পরবর্তী অনুচ্ছেদে নন্দনতত্ত্বের বহুল পরিচিত উলে-খযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে নন্দনতত্ত্বের মূল্য ও কর্ম-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাত হয়েছে।

নন্দনতত্ত্বের মূল্য ও কর্ম-প্রক্রিয়া আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, দর্শনের ইতিহাস, অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞানদর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মদর্শন ও নীতিবিদ্যা প্রভৃতি শাখার সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নন্দনতত্ত্বের উলে-খ না করে নীতিবিদ্যার পঠন-পাঠন মানে ভালো বা মঙ্গলের উলে-খ ছাড়াই নীতিবিদ্যা পড়ানো। এটা কখনও সম্ভব হতে পারে না। নীতিবিদ্যার আলোচনায় শিল্পকলা আর ধর্ম কখনও পরিত্যক্ত হতে পারে না। কারণ শিল্পকলা এমন একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যেখানে বস্ড়ুগুলো এমন একটি বিন্যাসরীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় যাতে তা আমরা উপভোগ করতে পারি (Mead, 1969 : 155)। মিড-এর এ উক্তি থেকে প্রতিপাদিত হয় যে, মূল্য একটি উপভোগের ব্যাপার হলেও তার অর্থ ও তাৎপর্যকে পদার্থিক বস্ড়ুর জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্ড়ু পদার্থিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থে তা আত্মগত বা বিষয়ীগত নয়। প্রকৃতকল্পে, মূল্য হলো আমাদের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ। এটি এমন এক সম্বন্ধ

যেখানে জগৎ কিছু গুণকে ধারণ করে, যা আমরা ছাড়া তাতে ধৃত হতো না। মূল্য এমন এক প্রক্রিয়া থেকে আসে যা বস্তুর ওপর কোনো কিছু করে। অর্থাৎ, এটি একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া।

গ্রিক নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে, এখনকার নন্দনতত্ত্ব মূল্যকে বিমূর্তভাবে চূড়ান্ড় ও নিখুঁত কোনো কিছুর মধ্যে খোঁজে না, তা খোঁজে শিল্পকলার মধ্যে। এক্ষেত্রে শিল্পকলাকে বিবেচনা করা হয় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে শিল্পী নিজেকে খুঁজে পান শিল্পের বিষয়ের মধ্যে। আধুনিক মানুষ যখন তার উচ্চতর আত্মচেতনা নিয়ে একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান। যদি তিনি বস্তুগুলোকে ঐক্যরূপ দেয়ার কাজে নিযুক্ত না হন, তাহলে তার পক্ষে তাদের সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করাও সম্ভব নয়। উপলব্ধি হালকা হয়ে যায় যদি না তা সৃষ্টির নিকটবর্তী হয়। কোনো কর্মই সৃজনশীল নয়, যদি ওই কর্ম-প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন মানুষও তা উপভোগ করতে না পারেন। যদি তিনি প্রক্রিয়াটি উপভোগ করতে সক্ষম হন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে, তার সৃষ্ট কর্মটি তার সমগ্র কর্মকাণ্ডের একটি আনন্দঘন সমাহার।

নান্দনিক অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অধ্যয়নের নাম নন্দনতত্ত্ব, যা কেবল এটাই দেখায় না যে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা কেন সবচেয়ে তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে এটাও সূচিত করে যে, একে যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত করা যায়, যেখানে মানুষ তার ইচ্ছে মতো বস্তুসমূহকে একত্র করতে সক্ষম। যখন মানুষ এই কাজটি করতে সক্ষম হয়, তখন এই মানুষ তার ব্যবহারিক চাহিদা থেকে মুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ড়িকর চিন্ড়া এবং আবেগ থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে। ওই সব মানুষের কাজের মধ্যে তাদের সুখের মূর্ত রূপায়ণ ঘটে, তাদের মনোভাব হয়ে ওঠে আসক্তিবিহীন এবং মানসিকভাবে অতিবর্তী। কিন্তু, তাদের কর্মকাণ্ডকে সর্ব সাধারণভাবে অভিগম্য হতে হলে, মানুষকে শিল্পীর কল্পনার অনুরূপ কিছুর অধিকারী হতে হবে, যাতে মানুষ বস্তুকে একত্র করার সেই তৃপ্তিকর সক্ষমতার অনুশীলন করতে পারে। আর এটাই হলো নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিক আলোচনার সামাজিক প্রতিপাদ্য।

টীকা

১. বাংলা ভাষায় 'দর্শন' শব্দটি প্রথম কে বা কারা ব্যবহার করেন, এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণ না থাকলেও Aesthetics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটির প্রথম ব্যবহারের মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পূর্বে বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে বিষয়টি অলঙ্কারশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যদর্শন, কান্ড়িবিদ্যা, শিল্পতত্ত্ব, শিল্পদর্শন, ক্রীড়াশাস্ত্র প্রভৃতি নামে সমধিক পরিচিত ছিল।

২. নান্দনিক মনোভাবের এ আদর্শটি আমাদের শ্রীমদ্ভগবদগীতার নিষ্কামকর্মের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, নিরাসক্তভাবে কর্মপালন করাই মানুষের কর্ম। গীতায় এ ধরনের কর্মকেই নিষ্কামকর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় Aesthetics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বীক্ষাশাস্ত্র বা সৌন্দর্যতত্ত্ব শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪. অবশ্য আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এক বিশেষ অর্থে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বকে প্রায়োগিক বলে মনে করেন। তাঁর নিজের ভাষায় : 'এইজন্য বীক্ষাশাস্ত্র (সৌন্দর্যতত্ত্ব) একদিকে যেমন স্বতন্ত্র একটি তত্ত্বাবেদক শাস্ত্র, অপরদিকে তেমনি সাহিত্য বা শিল্পের মূল্য নির্ধারণ করিতে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া ইহাকে একটি প্রায়োগিক (Practical) শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। দেখুন : (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ১৯৯৭ : ৪-৫)।

৫. এফ. সি. এস. শিলার (১৮৩৪-১৯৩৭) ছিলেন প্রয়োগবাদী দার্শনিক আন্দোলনের একমাত্র ব্রিটিশ প্রতিনিধি। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উইলিয়াম জেম্‌স-এর মতো তিনিও মনোবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন।

৬. বেনেডিটো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২) ছিলেন ইতালির একজন প্রখ্যাত নান্দনিক। নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর ধ্রুপদী *Aesthetics* শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ক্রোচের একজন সমসাময়িক ভাষ্যকার Douglas Ainslie তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : 'আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার করতে পেরেছি, এমন দাবি করব না, তবে আমি যে একজন কলম্বাসকে আবিষ্কার করেছি, একথা ধ্রুব সত্য। আমি যাঁকে আবিষ্কার করেছি তাঁর নাম বেনেডিটো ক্রোচে। তিনি থাকেন ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত নেপ্‌লস শহরে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের শীতকালে এই নেপ্‌লস শহরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই প্রখ্যাত নান্দনিকের।

৭. উৎসগত যুক্তিদোষ হচ্ছে এমন এক ধরনের হেত্বাভাস, যেখানে কোনো কিছুর যৌক্তিক বিচার-বিশে-ষণ না করে, অথবা যৌক্তিক বিচার বিশে-ষণকে পাশ কাটিয়ে কেবল উৎসগত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রে এ ধরনের হেত্বাভাসকেই বলে genetic fallacy.

8. Aesthetics as a philosophy, refers to the study of sensory values. This means the judgment or evaluation by the sensual and thought time has come to refer to critical or philosophical thought about art, clutter and nature.

৯. সুদক্ষতা ও জ্ঞানের প্রশংসা মানবিক কর্মকাণ্ডের সমস্ড় প্রকৌশলী পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত। সেখানে এর উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, একেবারে রান্না থেকে শুরু করে ছোট খাটো উপাসনালয় নির্মাণ, বন্দুক বা ঢিল ছোড়া ইত্যাদি সর্বত্র। আধুনিক সমাজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রকৌশলী দক্ষতা বিশেষভাবে প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হয়ে থাকে। তাই বিশেষ দক্ষতা এবং বিশেষ জ্ঞান বলতে ডাটন এখানে প্রকৌশলীর শৈল্পিক দক্ষতা এবং ধারাবাহিক জ্ঞানের কথাই বলেছেন।

১০. এই সুখকেই নান্দনিক সুখ (aesthetic pleasure) বলা হয়, যখন তা কোনো শিল্পকলা বা নান্দনিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। কিন্তু খেলাধুলার সুখ, আকাশে উড়ন্ড় পাখি দেখার সুখ, কিংবা নীলাকাশে মেঘের লুকোচুরি দেখার সুখ নিজ গুণেই কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয়।

১১. ডাটন এখানে নান্দনিকতার যে শৈলী (style)-র কথা বললেন, তা একটি সংস্কৃতি থেকে, একটি পরিবার থেকে, আবার একজন ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে। এই শৈলী হঠাৎ উদ্ভাবিত, গৃহীত ও পরিবর্তিত হতে পারে। তারপর খুব ধীর গতিতেও এই শৈলী আসতে পারে। আমাদের এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পকর্ম ও নান্দনিকতার বাইরেও শৈলী প্রায় সমস্ড় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। একারণে ডাটন শৈলীকে নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বলে মনে করেও একে নান্দনিকতা বা নন্দনতত্ত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দেননি।

১২. ডাটন-এর মতে, সমালোচনামূলক শব্দকোষ ও তর্ক-বিতর্কের ভাষার ক্রম-বর্ধমান বিকাশ নান্দনিক আলোচনার বাইরেও অন্যান্য সব মানবিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে স্বরূপত প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এর সঙ্গে উৎকর্ষের মানদণ্ড, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ব্যর্থতা-সাফল্য ইত্যাদি প্রসঙ্গও যুক্ত থাকে।

১৩. এ ব্যাপারে গ্রিস ও ভারতবর্ষের নন্দনতত্ত্ব মীমাংসার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, পে-টো-এরিস্টটল-এর ধারণার সঙ্গে ভারতীয় আচার্যদের ধারণার অনেকখানি মিল রয়েছে। এই ঐক্যের মূলে রয়েছে অনুকৃতিবাদ (theory of imitation)। পে-টোর সঙ্গে এরিস্টটল এবং পে-টো-এরিস্টটল-এর সঙ্গে ভারতের বিদ্যা বুদ্ধিগত পার্থক্য যাই হোক, শিল্প যে অনুকরণ বা অনুকৃতি, এ ব্যাপারে গ্রিক ও ভারতীয় সকল নান্দনিকেরাই প্রায় একমত।

১৪. শিল্পকলার বাইরে অথবা এর প্রান্তিক ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন : রাজনৈতিক মিছিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জন সমাবেশ, রাজ্যাভিষেক, বিবাহ ইত্যাদির গণউৎসব, ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা করার তাগিদ লক্ষ করা যায়।

১৫. একটি উচ্ছ্বসিত নৃত্যেরও কল্পিত উপাদান থাকে, যা কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে আমরা লক্ষ করতে পারি না। সব ধরনের নান্দনিক কর্মই সংঘটিত হয় একটি কল্পনার প্রেক্ষাগৃহে। এটি গতানুগতিক ব্যবহারিক জগৎ থেকে উঠে এসে একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে পড়ে। গতানুগতিক স্ড়রে সমাধান নিষ্কাশনের কল্পনা, কোনো কিছুর পরিকল্পনা, অনুমান, অন্যান্য মানবিক অবস্থা অথবা স্রেফ দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি ব্যবহারিকভাবে মানুষের স্বাভাবিক চেতনশীল জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে।

১৬. এরিস্টটল-এর নন্দনতত্ত্বও জাতিরূপ আদর্শের ক্রমবিন্যাসের অনুকূল মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যদিও তিনি তাঁর জৈব-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্ড়ুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্ড়ু নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলাকে তিনি জাতিভেদ আদর্শ থেকে বিশেষ বস্ড়ুর বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করতেন। এরিস্টটল-এর মতে, প্রকৃতির বিশেষ বস্ড়ুকে প্রকাশ করা নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার কাজ নয়। তার কাজ হলো জাতি বা সার্বিককে প্রকাশ করা, যাকে বাস্ড়বায়িত করতে প্রকৃতি সতত প্রযত্নশীল।

সহায়কপঞ্জি

অমলেন্দু বাসটি, ১৩৮১। 'এসথেটিক্সের কথা' : কলকাতা : *রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা*, সম্পাদনা : রমেন্দ্রনাথ মলি-ক, ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়।

এম. মতিউর রহমান (সম্পা.), ২০১৪। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব, ১ম খণ্ড*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২য় মুদ্রণ।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ২০০৪। *শিল্পতত্ত্ব পরিচয়*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৯৭। *সৌন্দর্যতত্ত্ব*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ।

Adorno, T. W. 1984. *Aesthetic Theory*, London : Routledge and Kegan Paul.

Beardsley, Morroe C. 1958. *Aesthetics : Problems in the Philosophy of Criticism*, New York : Harcourt, Brace.

Berleant, A. 1992. *The Aesthetics of Enrvironment.* Philadelphia : Temple University Press.

Burke, Edmund 1963. *On the Subline and Beauttiful*, New York : Harcourt, Brace.

Crawford, D. 1974. *Kant's Aesthetic Theory,* Madison : University of Wisconsin Press.

Ducasse, C. J. 1944. *Art, the Critique and You*, New York : Piest.

Gyuyer, T. Cohen and P. (eds.) 1982. *Essays on Kant's Aesthetics*, Chicago : University of Chicago Press.

Jerrett, James L. 1957. *The Quest for Beauty*, Engleewood Cliffs : Prentice-Hall.

Kaiser, C. Hillis 1952. *An Essay On Methods*, Now Brunswick : Rutgers University Press.

Keates, John *Ode on a Grecian Urn*. H. W. Garrod (ed.) 1973. *Keates' Practical Works*, London : Oxford University Press.

Leaman, Oliver 2004. *Islamic Aesthetics : An Introduction*, Edinburgh : Edinbungh University Press.

Matin, Abdul 2006. *An Outline of Philosophy*, Dhaka : Adhuna Prakashan, Second Edition.

Mead, George Hunter 1952. *An Introduction to Aesthetics*, New York : The Ronald Press Ltd.

Mead, George H. 1969. *Movements of Thought in Nineteenth Century*, London: Oxford University Press.

Sengupta, Kalyan 1971. *Indian Aesthetics : An Introduction*, New Delhi, Vahra Publiting House.

Shusterman, Richard 1992. *Pragmatist Aesthetics : Living Beauty, Re-thinking Art*, Oxford : Blackwell.

Sibley, Frank 2001. *Approach to Aesthetics, Collected Papers on Philosoprical Aesthetics*, London : Oxford University Press.

Sporshott, Francis 1982. *The Theory of the Art*, New York : Princeton University Press|

Titus, Harold H. 1968. *Living Issues in Philosophy*, New Delhi : Eurasia Publishing House (P.) Ltd., Fourth Edition.

Tolstoy, Leo 1938. *What is Art?*, London : Oxford University Press.

Vander, Lecuw G. 1963. *Secred, and Profane Beauty* : *The Holy in Art*, New York : Holt, Rinchart and Winston.

Zehou, Li 1994. *The Path of Beauty : A Study of Chinese Aesthetics*, Hong Kong : Oxford University Press.